আট-আনা-সংস্করণ গ্রন্থমালার ২য় গ্রন্থ।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ

মাঘ, ১৩২৪

প্রকাশক—শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়
মুখার্জ্জি বসু এণ্ড কোং
কর্ণওয়ালিস্ বিল্ডিংস,
কলিকাতা।

প্রিণ্টার—শ্রীরাখালচন্দ্র মিত্র,
"বিশ্বকোষ-প্রেস"
৯, বিশ্বকোষ লেন, বাগবাজার,
কলিকাতা।

উৎসর্গ পত্র

এই তোড়া

বাল্যসুহৃদ্

"অকলঙ্কশশী"

স্বর্গীয় শশিকুমার নিয়োগীর

পবিত্র স্মৃতির

উদ্দেশে

অর্পিত হইল।

কৃষ্ণনগর
১০ই মাঘ,
১৩২৪

শ্রীযতীন্দ্রমোহন সিংহ।

ভূমিকা

এই তোড়া বিয়ের ক'নের পায়ের তোড়া নয়, বরের বাপের টাকার তোড়াও নয়,—বরের হাতে দেওয়ার জন্য ফুলের তোড়া। কিন্তু ইহাতে বোধ হয় ফুলের চেয়ে পাতাই বেশী, ফুল অর্থাৎ গল্প যে দুই একটি আছে তাহাও প্রেমগন্ধহীন। সুতরাং ইহা বরের হাতে শোভা না পাইয়া হয়ত মাটীতে গড়াগড়ি যাইবে। তবে পাতাও একেবারে তুচ্ছ জিনিষ নয়, "সবুজ-পত্র"ই তার প্রমাণ। ইংলণ্ডের মহাকবি চসার বলিয়াছেন ফুল অপেক্ষা পাতার গৌরবই বেশী। সেই ভরসায় বঙ্গীয় পাঠকের হস্তে এই তোড়া দিলাম। আশা করি, নূতন নূতন গল্প-পুস্তকের রস-মাধুর্য্যের সঙ্গে ইহা চাটনির ন্যায় ব্যবহৃত হইবে। ইতি

গ্রন্থকার

সূচীপত্র

তোড়া

নূতন গুরু মহাশয়

বৈশাখ মাস,—প্রাতঃকাল,—সূর্য্য উঠিয়াছে। ধনঞ্জয়পুর গ্রামের গুরু মহাশয় নটবর দত্ত তাঁহার পাঠশালায় বসিয়া ছাত্রদিগকে পড়াইতেছেন। এই পাঠশালা গুরু মহাশয়ের নিজ বাড়ীতেই স্থাপিত। তাহার পূর্ব্বদিকে উদ্যান। অনেক দিন বৃষ্টি হয় নাই, সেজন্য মাঠের ঘাস ও গ্রামের গাছপালা রৌদ্রে ঝল্সিয়া গিয়াছে। মাটী শক্ত হইয়া পড়িয়াছে। কৃষকগণের চাষ বন্ধ হইয়াছে।

ধনঞ্জয়পুর একটি বড় গ্রাম। এখানে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, কৈবর্ত্ত, গোয়ালা, মুসলমান প্রভৃতি নানা জাতির বাস। এ গ্রামে আগে স্কুল ছিল না, তাই পেড্লার সাহেবের নব শিক্ষা-প্রণালী প্রবর্ত্তিত হওয়ার কিছু দিন পরেই নটবর দত্ত এই পাঠশালাটি স্থাপন করিয়াছেন।

এস্থলে এই গুরু মহাশয়ের কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। ইনি বর্দ্ধমান জেলার কোন এনট্রান্স স্কুলের তৃতীয় শ্রেণী পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন। সে আজ ১৫ বৎসরের কথা। তিনি যখন গ্রামে আসিয়া গল্প করিতেন—"পৃথিবীর আকার গোল—কমলালেবুর মত"—"ইংরেজিতে নাম লিখিতে হইলে শ্রী দিতে হয় না"—"ইংরেজদের দেশে সাহেবরা জমি চাষ করে"—ইত্যাদি ইত্যাদি—তখন গ্রামের চাষাগণ অতি সন্দিগ্ধ-চিত্তে তাঁহার সেই সকল জ্ঞান-গরিমা-সূচক কথা কান পাতিয়া শুনিত, কেহ বা তাঁহাকে পরিহাস করিত। পরে একদিন পরীক্ষা দিতে বসিয়া জুতার মধ্যে এক খানা কাগজে প্রশ্নের উত্তর লিখিয়া রাখিয়াছিলেন, এই অভিযোগে তিনি স্কুল গৃহ হইতে বহিষ্কৃত হন। তাহার পর কতক দিন কলিকাতায় গিয়া নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইলেন, পড়ার আর কোন সুবিধা হইল না, পড়া শুনা করার প্রবৃত্তিও বোধ হয় বেশী ছিল না। তাঁহার এক আত্মীয় বিশ্বম্ভর সরকার গৌহাটি চা-বাগানে কাজ করিত। নটবর তাহার শরণাপন্ন হইলেন। তিনি নটবরকে কুলী সংগ্রহ করিবার জন্য সর্দ্দার আড়কাটীর পদে অভিষিক্ত করিয়া মেদিনী-পুর জেলায় পাঠাইলেন। সেখানে ৩ বৎসর কাল অনেক নিরীহ ভাল মানুষকে কুলী করিয়া চালান দিলেন, বৈধ-অবৈধ উপায়ে অনেক টাকা রোজগার করিলেন, অনেক টাকা বদ্

খেয়ালা করিয়া উড়াইলেন। অবশেষে দুইজন সাঁওতালকে ফাঁকি দিয়া কুলী করিয়া চালান-দেওয়া-অপরাধে তাঁহার তিন মাস শ্রীঘর বাসের হুকুম হইল এবং হাতে যে-কিছু টাকা ছিল, তাহা সেই পূর্ব্ব পাপের প্রায়শ্চিত্তের দক্ষিণা স্বরূপ একজন উকিল ও দুইজন মোক্তারের উদরে স্থান পাইল।

জেল হইতে বাহির হইয়া আসিয়া নটবর মনে করিলেন, "না—আর ও পথে যাব না। এখন সদুপায়ে অর্থোপার্জ্জন করা যায় কি না, তাহাই একবার দেখিব।" সদুপায়ে অর্থোপার্জ্জন কিসে হয়? ভাল চাকুরী?—সেরূপ বিদ্যা নাই। ব্যবসা-বাণিজ্য?—তাহার মূলধন নাই। কৃষিকার্য্য?—একবার চেষ্টা করিয়া দেখিলে ক্ষতি নাই। যদি কৃষিকার্য্য করিতে হয়, তবে দেশে গিয়া করাই ভাল, ইহা মনে করিয়া তিনি ধনঞ্জয়পুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহার পৈতৃক ভিটা জঙ্গলময় হইয়াছিল। তিনি সেই জঙ্গল কাটাইয়া বাসোপযোগী কয়েক খানা খড়ের ঘর তুলিলেন। তাঁহার পৈতৃক যে-কিছু জমি ছিল, তাহাতেই একখানা লাঙল এবং একজন চাকরের সাহায্যে চাষ আরম্ভ করিলেন। ঠিক এই সময়ে পেড্লার সাহেবের নূতন শিক্ষাপ্রণালী বঙ্গদেশে প্রচলিত হইল।

নটবর মনে করিলেন, এ গ্রামে অনেকগুলি ছেলে আছে, ইহাদের লইয়া একটা পাঠশালা খুলি না কেন? তাহা হইলে

আমার কৃষিকার্য্যেরও অনেকটা সুবিধা হইতে পারে। ইহা ভাবিয়া তিনি নূতন শিক্ষা-প্রণালীর নিয়মাবলী খুব মনোযোগের সহিত পাঠ করিলেন। পরে একদিন ডেপুটি ইনস্পেক্টর মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নব প্রণালীতে স্কুল খুলিবার অনুমতিপত্র বাহির করিলেন। ডেপুটি ইনস্পেক্টর দেখিলেন, এ লোকটার বুদ্ধি আছে, বেশ কাজের লোক। হাতে কলমে শিক্ষা দেওয়ার প্রণালী বেশ বুঝিয়াছে এবং ইহার নানা বিষয়িণী অভিজ্ঞতাও আছে। ইহা দ্বারাই নূতন প্রণালীতে শিক্ষা দান আরম্ভ করা যাক। আগে শিক্ষক প্রস্তুত করিয়া পরে স্কুল স্থাপন করা অনেক বিলম্বের কথা। সরকারী কার্য্যে এত বিলম্ব সহ্য হয় না, কারণ "শুভস্য শীঘ্রম্!"

নটবর বাড়ী আসিয়া ৪০ জন ছাত্র সংগ্রহ করিয়া স্কুল খুলিলেন। তাঁহার বাহিরের চৌচালা ঘরে স্কুল বসিল। তাহার পার্শ্বেই বাগান। তিনি ছাত্রগণকে হাতে কলমে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন, কিন্তু গ্রাম্য অশিক্ষিত বর্ব্বর লোকেরা তাঁহার শিক্ষাপ্রণালীতে নানা প্রকার অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিল। মূর্খ লোকে নূতন শিক্ষা-প্রণালীর মাহাত্ম্য বুঝিবে কিরূপে?

এখন যাহা বলিতেছিলাম, তাহাই বলি। গুরু মহাশয় পাঠশালায় আসিয়াই ছাত্রদিগের রেজেষ্টরি বহি ধরিয়া তাহাদের

নাম ডাকিলেন। ছাত্রগণ একে একে নামের সাড়া দিল। পরে তিনি এইরূপে পড়ান আরম্ভ করিলেন।

"রহিম বিশ্বাস ?"

"উপস্থিত।"

"কাল তোমাকে গরুর কথা শিখাইয়াছি—গরুর কয় পা ?"

"চারি পা।"

"বেশ—বেশ। তোমার খুব পর্য্যবেক্ষণ-শক্তি। কয়টা শিং ?"

"দুটা।"

"বেশ—খুব ভাল।"

এখানে আর একটি ছেলে হাসিয়া বলিল—"আজ্ঞে, এ সব কথা ত আমরা আগেই জানিতাম, এ জন্য বই পড়ার দরকার কি ?"

"তুই বড় পণ্ডিত হয়েছিস্ কি না! বেয়াদপ্—পাজি—নচ্ছার !"

এই বলিয়া গুরু মহাশয় তাহার পৃষ্ঠে এক ঘা বেত মারিলেন। পরে রহিম বিশ্বাসের দিকে তাকাইয়া বলিলেন—"গরুর খুর কি রকম ?"

"বিভক্ত।"

"বেশ্। তোমার বেশ শিক্ষা হইয়াছে—তুমি যাও, এখন

নিজে ভাল করিয়া গরু দেখ গিয়া। আমার গোয়ালে যে কয়টা গরু আছে, তাহাদিগকে লইয়া মাঠে যাও। গরু ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া সময় নষ্ট করিও না, খুব ভাল করিয়া তাহাদিগকে পর্যা-বেক্ষণ করিবে। আর দেখিও, যেন অন্যের ফসল নষ্ট না করে।"

রহিম বিশ্বাস আদেশ মত গরু লইয়া মাঠে গেল।

তখন শিক্ষক মহাশয় আর একটি ছাত্রকে ডাকিলেন—"সতীশচন্দ্র সরকার?"

"উপস্থিত।"

"গরুর বিষ্ঠাকে কি বলে?"

"গোবর বা গোময়।"

"বেশ—গোবরে কি হয়?"

একটি বয়োজ্যেষ্ঠ ছাত্র বলিল—"পদ্মফুল হয়।"

অমনি গুরু মহাশয় ভয়ানক গরম হইয়া পড়িলেন এবং তাহার চুল ধরিয়া খুব কয়েকটা কিল তাহার পৃষ্ঠদেশে বসাইয়া দিলেন।

সতীশ বলিল—"আজ্ঞে গোবর দিয়া ঘর নিকান হয়।"

"আর কি হয়?"

"ঘসি প্রস্তুত হয়।"

"আর কি হয়?"

"জমিতে সার দেওয়া হয়।"

"বেশ—বেশ—তুমি খুব ভাল ছেলে। তোমার খুব বিদ্যা হবে। আচ্ছা, এখন আমি যাহা বলি, তাহাই কর। জান ত বিদ্যা হাতে কলমে—এক্সপেরিমেণ্ট্ করিয়া শিখিতে হয়। মুখস্থ বিদ্যাকে আমরা একেবারে বর্জ্জন করিব। তুমি যাও, আমার গোয়ালে যে সব গোবর পড়িয়া আছে, সেগুলি একটা ঝুড়িতে করিয়া ঐ বাগানে নিয়া রাখ। পরে সেখানে থাকিয়া উহা পচিলে ভাল সার হইবে। তখন উহা ক্ষেতে দিয়া দেখিবে, কেমন ভাল ফসল উৎপন্ন হইয়াছে। গোয়াল ভাল করিয়া পরিষ্কার করিও, যেন দুর্গন্ধ না থাকে।"

সতীশ এই কার্য্যে প্রস্থান করিল। তখন গুরু মহাশয় যদুনাথ দাস নামক আর একটি ছাত্রকে ঘর নিকানর উপকারিতা কি বুঝাইয়া দিয়া তাহাকে ঘর নিকাইতে পাঠাইলেন।

পরে গুরু মহাশয় দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রদিগকে বলিলেন—"তোমরা অবশ্যই গাছ কাহাকে বলে জান। ঐ বাগানে দেখ কত রকম গাছ আছে—আম গাছ, কাঁঠাল গাছ, নেবু গাছ, কুল গাছ ইত্যাদি। একটি গাছের কয়টা অংশ?"

একটি ছাত্র। "দুই অংশ।"

"কি?"

"শিকড় ও কাণ্ড।"

"বেশ—শিকড় দিয়া কি হয়?"

"গাছ রস শুষিয়া খায়।"

"বেশ—বেশ। আর পাতা দিয়া কি হয়?"

"কলার পাতায় ভাত খায়, তালপাতায় লেখে—"

"আরে আমি তা চাই না। পাতা দিয়া গাছের কি উপকার হয়?"

"গাছের বৃষ্টি নিবারণ হয়।"

"না—তা নয়। পাতা বায়ু হইতে গ্যাস্ টানিয়া লয়, তাহাও গাছের আহার।"

"আজ্ঞে গ্যাস্ কি?"

"গ্যাস্—গ্যাস্ জানিস্ না? পাথুরে কয়লা পোড়াইলে গ্যাস্ বাহির হয়। আমি রাণীগঞ্জে তাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছি।"

"আজ্ঞে, এখানে পাথুরে কয়লা কোথায়?"

"আরে বোকা জানিস্ না? পাথুরে কয়লা সর্ব্বত্রই আছে, মাটি খুঁড়িলেই বাহির হয়, নতুবা এখানে গ্যাস্ থাকিবে কেন? যাক্ সে কথা। এই যে সকল গাছ দেখিতেছ, বল ত উহাদের গোড়ায় আগাছা জন্মিলে তাহাতে গাছের কি হয়?"

একটি ছাত্র। "জঙ্গল হয়।"

আর একটি ছাত্র। "তাহাতে পাখীরা বাসা করে।"

গুরু। "তুমি কেবল পাখীর বাসাই চেন? আগাছা

জন্মিলে গাছ বাড়ে না। সেই জন্য আগাছা কাটিয়া ফেলা কর্ত্তব্য। বুঝিলে?

ছাত্রগণ। "হাঁ, বুঝিলাম।"

"আচ্ছা, বিনোদ, হরি, কালাচাঁদ, রাখাল—তোমরা কয় জনে দা লইয়া ঐ বাগানে যাও, আর যত আগাছা দেখিবে, সব—কাটিয়া ফেলিবে। পরে তোমরা দেখিতে পাইবে, এই সকল আম, কাঁঠাল ও অন্যান্য ফলবান্ বৃক্ষে কত ফল ধরিয়াছে।"

একটি ছাত্র। "সে ত আর এবার না?"

"এবারই ধরিবে—তোমরা নিজের চক্ষেই দেখিতে পাইবে। বিদ্যা নিজ নিজ চক্ষে দেখিয়া শিক্ষা করাই কর্ত্তব্য। বুঝিলে?"

উল্লিখিত ছাত্রগণ তখন জঙ্গল কাটিতে গেল।

এইরূপে গুরুমহাশয় তাঁহার ছাত্রদিগকে নানা বিভাগে হাতে-কলমে শিক্ষা দিতে লাগিলেন। জলের গুণ শিক্ষা দিবার জন্য দুইজন ছাত্রকে কূপ হইতে জল তুলিয়া তাঁহার বাগানে ও ক্ষেত্রে জলসেক করিতে নিযুক্ত করিলেন। বাঁশের উপকারিতা শিক্ষা দেওয়ার জন্য তিনটি বালককে বাঁশ চিরিয়া বাখারি প্রস্তুত করিতে দিলেন, তাহা দিয়া বাগানের বেড়া দেওয়া হইবে। একটি ছাত্র বাঁশের বেতি তুলিয়া গুরু মহাশয়ের জন্য একটা ধুচুনি প্রস্তুত করিতে লাগিল।

এই সময়ে হঠাৎ একটা গোল উঠিল। গ্রামের ভদ্র-অভদ্র অনেক গুলি লোকের সঙ্গে স্বয়ং ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গ্রামের শরৎবাবু ডেপুটিবাবুকে বলিলেন—"এই দেখুন মশাই! আমরা যাহা বলিয়াছি, তাহা ঠিক কিনা! গুরু মহাশয় ছেলেদের দিয়া কিরূপে নিজের সব কাজ করাইতেছেন,—যত চাষার কাজ, ভদ্রলোকের ছেলেদের দিয়া করাইতেছেন,—এ ভারি অন্যায়!"

এই কথা বলিতে বলিতে গুরু মহাশয়ের ইঙ্গিত মতে সব ছেলে আসিয়া যথাস্থানে বসিল—কেবল আসিল না রহিম বিশ্বাস। তাহার বাপ কেফাতুল্লা সঙ্গে আসিয়াছিল। সে গুরু মহাশয়কে বলিল—"বাবু, আমার ছেলেকে কোথায় পেঠিয়েছেন?"

একটি ছেলে বলিল—"সে গুরু মহাশয়ের গরু চরাইতে মাঠে গিয়াছে।"

গুরু মহাশয় তাহার দিকে রোষ-কষায়িত নেত্রে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন—"তাহাকে গরুর সমস্ত অবয়ব পর্য্যবেক্ষণ করিতে পাঠাইয়াছি।"

কেফা। পণ্ডিত মহাশয়, আমরা চাষা নোক—আমাদের মোটা বুদ্ধি। আমরা তোমার ওসব দোমবাজির কোন এলাকা রাখি না। আপনি যদি তারে মাঠে গরু চরাতি পেঠাইলেন,

তবে আমি ঘরের গরু রাখতি না দিয়ে তারে কেন এখানে দিইলাম? বাবু, এ কথাডার বিচার করেন।"

ইহা বলিয়া ডেপুটিবাবুর দিকে মিনতিপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল।

ডেপুটিবাবু এতক্ষণ কোন কথা বলেন নাই। এখন গম্ভীর ভাবে বিরক্তিপূর্ণ স্বরে গুরু মহাশয়ের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "এ সব কি হচ্ছে?"

নটবর জোড় হস্তে বলিলেন—"হুজুর এ ঠিক মত কাজ হইতেছে। আপনারা যেরূপ উপদেশ দিয়াছেন, আমি তার এক চুলও এদিক্-ওদিক্ করি নাই। যাহাকে হাতে কলমে শিক্ষা দেওয়া বলে, আমি ঠিক তাহাই দিতেছি।"

শরৎ বাবু কিঞ্চিৎ উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "না—কখনই না—গভর্মেণ্টের অভিপ্রায় কখনই এরূপ নহে। গ্রামের সব ছেলে আসিয়া তোমার মুনিষ খাটিবে, ইহা কখনই গভর্মেণ্টের রুল নহে।"

নটবর। "আপনি হালে আইনের শিক্ষাপ্রণালীর রুল কি, তাহা জানেন না। ছেলেদিগকে মাটী, জল, গাছ প্রভৃতি দ্রব্যের গুণ শিক্ষা দিতে হইবে—তাহারা নিজের চক্ষে এগুলি দেখিয়া শিখিতে অভ্যস্ত হইবে, ইহাই হইতেছে রুল। আমি ত ঠিক তাহাই করিতেছি। তবে প্রভেদের মধ্যে এই, আমি এ সকল

জিনিষ নিজের বাড়ী হইতে দিতেছি, এজন্য স্কুলের কোন অতিরিক্ত খরচ হইতেছে না। হুজুর কি বলেন ?"

ইহা বলিয়া ডেপুটি বাবুর দিকে একবার কাতর দৃষ্টিপাত করিলেন।

ডেপুটি বাবু বলিলেন—"আচ্ছা, তুমি কি প্রকারে এ সকল শিক্ষা দিতেছ, আমাকে দেখাও।"

তখন নটবর ছাত্রদিগকে পূর্ব্বে যেরূপ পড়াইতেছিলেন, সেইরূপ পড়ান আরম্ভ করিলেন। তবে গরু-চরান, জঙ্গল কাটা প্রভৃতি উপদেশগুলি বাদ দিলেন।

ডেপুটি বাবু এই শিক্ষাপ্রণালী দেখিয়া বলিলেন, "হাঁ,—আধুনিক শিক্ষাপ্রণালী এইরূপই বটে। তুমি ইহার principle বেশ grasp করিয়াছ, তবে practically কিছু বাড়াবাড়ি করিয়াছ, তাহা আর করিও না।"

শরৎ বাবু বলিলেন—"মহাশয়, এই শিক্ষাপ্রণালীর principle যাহাই থাকুক, আমরা practically যাহা দেখিতেছি, তাহা কখনও অনুমোদন করিতে পারি না। শিক্ষক মহাশয় এই সকল বালককে কেন চা-বাগানের কুলি করিয়া তুলিয়াছেন, উহার বিচার করুন। আমরা এরূপ পাঠশালা চাই না।"

ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টর এ কথার কোনও উত্তর না দিয়া ছাত্রদিগের পরীক্ষা আরম্ভ করিলেন। তিনি একটি ছেলেকে "নিম্ন

প্রাইমেরি রিডার” পড়িতে বলিলেন। সে পড়িল—“গরুর প্রধান আহার ঘাস। উহারা মাঠে চরে। জিহ্বা, ঠোঁট ও চুয়ালের সাহায্যে ঘাস কাটিয়া মুখের ভিতরে লয় এবং না চিবাইয়া গিলিয়া ফেলে। ইহাদের উদর চারি-কুঠারি-বিশিষ্ট।”

ডেপুটি। “আচ্ছা বল দেখি, গোরুর পেটে যে চারিটি কুঠারি আছে, তাহাদের কি প্রকার ক্রিয়া হয়?”

একটি বালক দাঁড়াইয়া সেই পুস্তকের কথা অবিকল মুখস্থ বলিল—“প্রথমে গরু চরিবার সময় যত ঘাস পারে, প্রথম কুঠারি দিয়া দ্বিতীয় কুঠারিতে পাঠায়। দ্বিতীয় কুঠারি ভরিয়া গেলে, চরা বন্ধ করে। পরে ইচ্ছা মত দ্বিতীয় কুঠারি হইতে ঘাস বাহির করিয়া আনিয়া চিবায়, চিবান হইলে উহা আবার গিলে; কিন্তু সে গিলিত ঘাস দ্বিতীয় কুঠারিতে না গিয়া তৃতীয় কুঠারি দিয়া চতুর্থ কুঠারিতে গিয়া পৌছায়। ইহাকে জাবর কাটা বলে।”

ডেপুটি। “আচ্ছা, বল ত গরুদের এই জাবরকাটার অভ্যাস কি রকমে হইল?”

আর একটি ছেলে দাঁড়াইয়া আবার সেইরূপ মুখস্থ বলিতে লাগিল—“বন্য অবস্থায় গোজাতি সিংহ ব্যাঘ্রাদির ভয়ে বড় ভীত থাকিত। সেজন্য সুবিধা হইলেই তাড়াতাড়ি যত ঘাস পারিত, পেটের মধ্যে ভরিয়া পলাইত, পরে অন্য সময়ে আস্তে আস্তে উহা চিবাইয়া গিলিত।”

ডেপুটি। "বেশ। ঠিক হইয়াছে। আচ্ছা, তুমি কি পড় ?"

একটি উচ্চ প্রাইমেরি শ্রেণীর নবমবর্ষীয় শিশু দাঁড়াইয়া বলিল—"আজ্ঞে, আমি পড়ি আদর্শপাঠ, বিজ্ঞানপাঠ, শিশু ব্যাকরণ, ইতিহাস, ভূগোলপাঠ, ব্যবহারিক জ্যামিতি ও পরিমিতি, পাটীগণিত, Infant reader, ড্রইং।

শরৎ বাবু এতক্ষণ চুপ করিয়া শুনিতেছিলেন, তিনি আর থাকিতে না পারিয়া ডেপুটি বাবুকে বলিলেন—"মহাশয়, আমার একটা জিজ্ঞাস্য আছে। আপনাদের নূতন শিক্ষাপ্রণালীর উদ্দেশ্য কি তাহা আমরা ভাল বুঝি না। শুনিতে পাই আপনারা না কি মুখস্থ বিদ্যার উপর ভয়ানক চটা। মুখস্থ বিদ্যাকে (cramming) আপনারা পাঠশালার ত্রিসীমানার মধ্যেও আসিতে দিতে চাহেন না। আমার বিশ্বাস, সেই মুখস্থ বিদ্যাটা যদি মানুষের মত কোন প্রত্যক্ষ প্রাণী হইত, তবে গভর্মেণ্ট তাহাকে এত দিন আণ্ডামান দ্বীপে পাঠাইতেন। কিন্তু ঐ নিম্ন প্রাইমেরী শ্রেণীতে আপনি যে পরীক্ষা করিলেন, উহাতে কি বুঝিলেন ? আমি ত দেখিলাম, ছেলেরা আগাগোড়া সেই মুখস্থ কথাই বলিয়া গেল। আর সে বেচারীদেরই বা দোষ কি ? আপনারা হাতে কলমে শিক্ষা দিতে চান, আচ্ছা, গরুর পেটে কয়টা কুঠারি আছে তাহা গরুর পেট চিরিয়া না দেখাইলে ছেলেরা কি প্রকারে স্বচক্ষে দেখিয়া শিখিতে পারে ? সেরূপ

পেট চিরিয়া শিক্ষা দেওয়াটা Medical Collegeএর anatomy বিভাগের জন্য মুলতুবি রাখিলে ভাল হয় না কি? এই ক্ষুদ্র পাড়াগেয়ে পাঠশালায় সেরূপ শিক্ষা সম্ভবপব হইতে পারে কি? তাহা যদি না হয়, তবে অবশ্যই ছেলেরা পুস্তকে যাহা পড়িবে, তাহাই মুখস্থ করিয়া রাখিবে; সুতরাং ঘুরিয়া-ফিরিয়া সেই মুখস্থকেই আপনারা প্রশ্রয় দিতেছেন। আরও দেখুন এই নবমবর্ষীয় শিশু উচ্চ প্রাইমেরী ক্লাসে পড়িতেছে। ইহাকে কতগুলি নূতন নূতন বিষয় পড়িতে হইতেছে, তাহা ভাবিলে মাথা ঘুরিয়া যায়। এই সকল সুকুমার শিশুদের মস্তিষ্কে এতগুলি কঠিন বিষয় চাপাইয়া দিলে, তাহাদের বুদ্ধি বৃত্তির বিকাশ হইবে, না বিনাশ হইবে?"

ডেপুটি। "কেন, তাহারা বুঝিয়া পড়িবে।"

শরৎ। "এসকল কঠিন কঠিন বিষয় আমরাই কি সব বুঝিতে পারি? আমরা ত দেখিতে পাই ছাত্রগণ কিছুই না বুঝিয়া এই সকল বই আগাগোড়া মুখস্থ করিতেছে। আপনি পরীক্ষা করিলেই তাহা বুঝিতে পারিবেন। আর যদি আমার বেয়াদবী মাপ করেন, তবে একটা কথা বলি। এইরূপ শিক্ষা প্রণালী একশত বৎসর এদেশে চলিলে, আপনারা মনুষ্য জাতিকে গো জাতিতে পরিণত করিবেন।"

ডেপুটি। "সে কেমন?"

শরৎ। এই যে গরুদিগের "গিলিত চর্ব্বণের" কথা শুনিলাম, শিশুগণও পাঠ্য বিষয়ের সেই রূপ গিলিত চর্ব্বণ আরম্ভ করিবে, এবং ক্রমে তাহাদের পেটে—ঠিক পেটে না হউক—মস্তিষ্কের মধ্যে চারিটি কুঠারি প্রস্তুত হইবে—এই উচ্চ প্রাইমেরী ক্লাসে বিজ্ঞান পাঠ, জ্যামিতি, পরিমিতি প্রভৃতি বিদ্যা প্রথম কুঠারিতে বোঝাই হইয়া থাকিবে, পরে বি, এ, কিংবা এম্, এ, ক্লাসে গেলে তাহার জাবর কাটা আরম্ভ হইবে। কিন্তু আমার একটা বিষয়ে কিঞ্চিৎ সন্দেহ আছে। পুরাকালে সিংহ ব্যাঘ্রাদি জন্তুর ভয়ে যেন গোজাতি অতি অল্প সময়ের মধ্যে যত ঘাস পারিত পেটের মধ্যে বোঝাই করিয়া লইয়া পলাইত। কিন্তু এখন এই শিশুগণ কাহার ভয়ে তদনুরূপ আচরণ করিতে বাধ্য হইতেছে?"

ছাত্রদিগের মধ্যে হইতে অমনি একটি ছেলে বলিয়া উঠিল—"পেড্লার সাহেবের ভয়ে।"

ইহার পরেই একটা মহা গণ্ডগোল উপস্থিত হইল "ধর ধর, মার মার।" সেই ছেলেটি চম্পট দিল। সেই দিন হইতে নটবর দত্তের সাধের পাঠশালা ভাঙ্গিয়া গেল। তাঁহাকে জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য নূতন ক্ষেত্রের অনুসন্ধানে বাহির হইতে হইল।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের পুরাবৃত্ত।

সত্যযুগে মালব প্রদেশে ইন্দ্রদ্যুম্ন নামে এক নরপতি ছিলেন। তিনি ভগবান বিষ্ণুর অন্বেষণে উত্তরদক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম এই চারিদিকে চারি জন ব্রাহ্মণ পাঠাইয়াছিলেন। তিন দিক্ হইতে ব্রাহ্মণগণ বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিলেন, কিন্তু যিনি পূর্ব্বদিকে গিয়াছিলেন তিনি ফিরিলেন না। তিনি অনেক বন জঙ্গল অতিক্রম করিয়া অবশেষে এক শবরদেশে আসিয়া পড়িয়াছিলেন। শবরজাতি উড়িষ্যার আদিমনিবাসী। ব্রাহ্মণ বাসুশবরের গৃহে বাসা করিলেন। বাসু তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া জানিতে পারিয়া, জোর করিয়া ধরিয়া তাহার মেয়ের সঙ্গে বিবাহ দিল। ব্রাহ্মণ জাতি হারাইয়া সেই শবরের মধ্যে বাস করিতে লাগিলেন। বাসুশবর জগন্নাথের একজন ভক্ত ছিল। সে প্রত্যহ বনে গিয়া ফল-পুষ্পদ্বারা তাঁহার পূজা করিয়া আসিত। একদিন প্রাতঃকালে তাহার কন্যার অনুরোধ এড়াইতে না পারিয়া সেই ব্রাহ্মণকে সঙ্গে করিয়া লইল। পাছে ব্রাহ্মণ সেই জঙ্গলের পথ চিনিতে পারেন এই ভয়ে তাঁহার চক্ষু বাঁধিয়া লইয়া চলিল। কিন্তু ব্রাহ্মণও বড় চতুর ছিলেন।

তিনি যাইবার কালে তাঁহার স্ত্রীর নিকট হইতে একথলি সরিষা লইয়া গিয়াছিলেন, তাহা পথে ছড়াইতে ছড়াইতে চলিলেন। শবর তাঁহার চক্ষু খুলিয়া দিলে ব্রাহ্মণ একটী অক্ষয়বটমূলে নীল-মাধব-মূর্ত্তি দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। শবর তাঁহাকে সেখানে রাখিয়া ফল-মূল-আহরণে চলিয়া গেল। ব্রাহ্মণ এদিকে জগন্নাথের স্তব আরম্ভ করিলেন। তিনি দেখিলেন, একটী কাক হঠাৎ বৃক্ষশাখা হইতে জগন্নাথের সম্মুখে ভূমিতে পড়িয়া গিয়া তৎক্ষণাৎ দিব্যমূর্ত্তি ধারণ করিয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিল। ব্রাহ্মণও বিষ্ণুলোকে গমনের এই সহজ উপায় অবলম্বন করিবার জন্য গাছে চড়িলেন। তিনি গাছ হইতে লম্ফ দিয়া পড়িবেন এমন সময়ে দৈববাণী হইল,—"কর কি! কর কি! তুমি প্রথমে তোমার রাজার নিকট গিয়া খবর দেও যে, জগন্নাথকে পাওয়া গিয়াছে।"

ইতিমধ্যে শবর ফল-পুষ্প সংগ্রহ করিয়া আনিল ও তদ্দ্বারা জগন্নাথের পূজা করিল। কিন্তু জগন্নাথ তাহাকে দর্শন দিলেন না। পরে দৈববাণী হইল "রে ভক্ত! তোর এই বনের ফুল-ফল আর আমার ভাল লাগে না। আমি এখন পক্ক-অন্ন ও মিষ্টান্ন খাইতে চাই। তুই আর আমাকে নীলমাধব-মূর্ত্তিতে দেখিতে পাবি না। আমি এখন হইতে জগন্নাথ নাম গ্রহণ করিলাম।" এই দৈববাণী শুনিয়া শবর দুঃখিত অন্তঃকরণে

ব্রাহ্মণকে লইয়া গৃহে ফিরিয়া আসিল। সে কতকদিন পর্যন্ত ব্রাহ্মণকে জঙ্গলে আটক করিয়া পরিশেষে তাহার কন্যার করুণ প্রার্থনায় ছাড়িয়া দিল।

ব্রাহ্মণ বিদায় হইয়া তাঁহার সেই রাজার নিকট গিয়া শুভ সংবাদ প্রদান করিলেন। রাজা শুনিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলেন ও তেরলক্ষ পদাতি ও অসংখ্য কাঠুরিয়া লইয়া জঙ্গল পরিষ্কার করিতে করিতে চলিলেন। ৮০০ মাইল পথ যাইয়া তাঁহারা নীলাচলে উপস্থিত হইলেন। তখন রাজার মনে গর্ব্ব উপস্থিত হইল ; তিনি ভাবিলেন "তাইত আমার মত সৌভাগ্য-শালী জগতে আর কে আছে ? মহাপ্রভু তাঁহার নাম-মাহাত্ম্য-প্রচার ও মন্দির নির্ম্মাণের জন্য আমাকে বাছিয়া বাহির করিয়াছেন।" কিন্তু রাজার এই অহঙ্কার দেখিয়া জগন্নাথ বলিলেন "বটে! আচ্ছা মজা দেখাইতেছি।" তখন দৈববাণী হইল, "শুন রাজা, তুমি আমার মন্দির নির্ম্মাণ করিবে বটে, কিন্তু আমার দেখা পাইবে না। তোমার মন্দির নির্ম্মাণ শেষ হইলে আমাকে খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে।" তৎক্ষণাৎ জগন্নাথ অন্তর্হিত হইলেন। ঠাকুরের লুকোচুরি খেলার অভ্যাসটা বোধ হয় চিরদিনই সমান!

এদিকে ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা মন্দির নির্ম্মাণ শেষ করিলেন, কিন্তু সেই মন্দির প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন এরূপ উপযুক্ত লোক তিনি

পৃথিবীতে খুঁজিয়া পাইলেন না। সুতরাং তিনি স্বয়ং সশরীরে স্বর্গধামে গমন করিয়া ব্রহ্মাকে মন্দির প্রতিষ্ঠা করিতে অনুরোধ করিলেন। তখনকার দিনে স্বর্গে যাতায়াতটা বোধ হয় আজ-কালকার দিনের বিলাত যাওয়ার মত সোজা ছিল। ব্রহ্মা তখন তাঁহার তপস্যা কেবল আরম্ভ করিয়াছেন; সেই তপস্যা শেষ হইতে মানবীয় নয় যুগ অতীত হইল। ইন্দ্রদ্যুম্ন এতাবৎ কাল স্বর্গে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। বোধ হয় স্বর্গে যাইয়া তাঁহার আয়ু বাড়িয়াছিল। তিনি স্বর্গে থাকিলেন, এদিকে মর্ত্যধামে কিন্তু অন্যান্য অনেক রাজা রাজত্ব করিয়া গেলেন। মন্দিরের চতুর্দ্দিকে তিনি যে নগর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা ক্রমে ক্ষয় ও লয়প্রাপ্ত হইল। সেই উচ্চ মন্দিরও সমুদ্রের বালির তলে চাপা পড়িয়া গেল। একদিন সেখানকার রাজা সমুদ্রকূলে ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতেছিলেন, হঠাৎ সেই বিস্মৃত মন্দিরের চূড়া পায়ে ঠেকিয়া তাঁহার ঘোড়া পড়িয়া গেল। তখন রাজা তাঁহার ভৃত্যগণের দ্বারা সেই গভীর বালুকাস্তর খনন করিয়া দেখিলেন, জগন্নাথের মন্দির প্রথম নির্ম্মাণের সময়ে যেরূপ টাট্‌কা ও তাজা ছিল, এখনও ঠিক সেইরূপ রহিয়াছে।

এদিকে ব্রহ্মার ধ্যানভঙ্গ হইল। রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন তাঁহাকে লইয়া সেই মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য ধরাধামে আনিলেন। কিন্তু এক গোল বাধিল। সেখানকার সেই রাজা ইন্দ্রদ্যুম্নকে বলিলেন,

"এ মন্দির তোমার নহে, আমি ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছি।" ইন্দ্রদ্যুম্ন বলিলেন "বাঃ রে! তুমি দেখিতেছি একজন তৈয়ার খদ্দের!" ব্রহ্মা এই দুই রাজার বিবাদ নিষ্পত্তি করিতে বসিলেন। তিনি প্রথম সাক্ষী ভূষণ্ডী কাককে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। ভূষণ্ডীকাক তাঁহার তপস্যায় নিমগ্ন ছিলেন, তিনি বিরক্ত হইয়া বলিলেন "তুই বেটা কেরে আমাকে ডাকিস্?" ব্রহ্মা বলিলেন, "আমি বেদকর্ত্তা ব্রহ্মা। কিরে কাক! তোর এতদূর সাহস যে তুই আমাকে অগ্রাহ্য করিস্!" ব্রহ্মা কিন্তু আজকালকার দুই একজন কড়া হাকিমের মত, তৎক্ষণাৎ আদালত-অবজ্ঞার জন্য মোকদ্দমা রুজু করিয়া ভূষণ্ডী কাকের জরিমানা করিতে অবশ্যই পারিতেন। কিন্তু তাঁহার ধৈর্য্যের প্রশংসা করিতে হয়। ভূষণ্ডী কাকও নাছোড়বান্দা, তিনি বলিলেন "বটে! তুমি ব্রহ্মা! কিন্তু কোন্ ব্রহ্মা! আমি তোমার মত এক হাজার ব্রহ্মাকে হইতে ও মরিতে দেখিয়াছি। তাহার মধ্যে একজন ব্রহ্মার এক হাজার মাথা ছিল, তিনি মাত্র পাঁচদিন বাঁচিয়া ছিলেন। তুমিত কা'লকের ছেলে, বিষ্ণুর শরীর হইতে জন্মিয়াছ।" কাকের কথা শুনিয়া ব্রহ্মা আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন ও তাহার স্তবস্তুতি করিলেন। তখন ভূষণ্ডী কাক প্রসন্ন হইয়া বলিলেন "হাঁ, এ মন্দির ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা নির্ম্মাণ করিয়াছেন।" তখন ব্রহ্মাও অবশ্য ইন্দ্রদ্যুম্নের পক্ষে ডিক্রি দিলেন।

কিন্তু ইন্দ্রদ্যুম্ন রাজা এত করিয়াও জগন্নাথের দর্শন পাইলেন না। তিনি ক্ষান্ত হইবার লোক নহেন। তিনি নানা প্রকার কঠোর তপস্যা আরম্ভ করিলেন। অবশেষে তাঁহার তপস্যায় তুষ্ট হইয়া ভগবান তাঁহার নিকট স্বপ্নে আবির্ভূত হইলেন এবং তাঁহাকে বালির উপরে সমুদ্রজলে অর্দ্ধনিমগ্ন একখণ্ড কাষ্ঠ দেখাইয়া দিলেন। রাজা কিন্তু তাঁহার সমস্ত সৈন্যবল ও ৫০০০ হস্তী লাগাইয়াও তাহা টানিয়া উঠাইতে পারিলেন না। তখন মহাপ্রভু আবার স্বপ্নে আবির্ভূত হইয়া রাজাকে তাহার অহঙ্কারের জন্য তিরস্কার করিলেন। পরে সেই বাসু শবর আসিয়া সেই কাষ্ঠ-খণ্ডকে অনায়াসে তীরে উঠাইল। এ ব্যক্তির পরমায়ুও ত কম ছিল না।

সেই কাষ্ঠখণ্ডদ্বারা জগন্নাথের মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিবার জন্য রাজা তাঁহার এলাকার সমস্ত সূত্রধর ডাকাইলেন ও তাহাদিগকে পারিশ্রমিকস্বরূপ অনেক গ্রাম ও ভূমি দান করিলেন; কিন্তু সেই কাষ্ঠখণ্ড কাটিতে গিয়া তাহাদের অস্ত্র ভোঁতা হইয়া গেল। তাহারা হাতুড়ী দিয়া বাটালি পিটিল, কিন্তু হাতুড়ী ছুটিয়া গিয়া তাহাদের হাত জখম করিল। অবশেষে মহাপ্রভু স্বয়ং একজন বৃদ্ধ ছুতারের বেশে রাজার নিকট অবতীর্ণ হইলেন ও অনেক অলৌকিক কার্য্যদ্বারা নিজের অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় দিলেন। রাজা তাঁহাকে একাকী মন্দিরের মধ্যে থাকিয়া

মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিতে নিযুক্ত করিলেন। কথা রহিল যে, ২১ দিনের মধ্যে অন্য কেহ মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারিবে না। এই অঙ্গীকারে আবদ্ধ হইয়া রাজা মন্দিরের দরজায় শিলমোহর লাগাইয়া দিলেন। কিন্তু শিলমোহর লাগাইলে কি হয়?

স্ত্রীর আবদারে বাধ্য হওয়াটা কেবল আমাদের কলিকালের বাঙ্গালীর একচেটিয়া বলিয়া বোধ হয় না। সেই সত্যযুগেও ইহা ছিল। তাহার প্রমাণ এই রাজা। তাঁহার স্ত্রী বন্ধ্যা ছিলেন। তিনি জগন্নাথ মহাপ্রভুর মুখ দেখিয়া সন্তানলাভ করিবার আশায় সেই ২১ দিনের মধ্যেই মন্দিরের দ্বার খুলিবার জন্য জিদ করিলেন। তিনি এই কয়টা দিন কেন সবুর করিতে পারিলেন না, তাহা ইতিহাসে লেখে না। রাজা নাচার, অগত্যা মন্দিরের দ্বার খুলিতে সম্মত হইলেন। মন্দিরের দ্বার খুলিয়া দেখিলেন জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার তিনটী মূর্ত্তির কেবলমাত্র কোমরের ঊর্দ্ধভাগ নির্ম্মিত হইয়াছে, জগন্নাথ ও বলরামের হাতের কতক অংশ গঠিত হইয়াছে কিন্তু সুভদ্রার হাত একেবারেই হয় নাই। মূর্ত্তি-নির্ম্মাণ এই পর্য্যন্ত ক্ষান্ত রহিল। রাজা অপরাধ হইয়াছে বুঝিয়া মহাপ্রভুর স্তবস্তুতি করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু স্তবে তুষ্ট হইয়া রাজাকে বর মাগিতে বলিলেন। রাজা বর চাহিলেন "এই তিনটী মূর্ত্তির নিকট

যেন চিরদিনই সমানভাবে ভোগ দেওয়া চলে, কখনও তাহার ব্যতিক্রম না ঘটে। আর মন্দিরের দ্বার যেন প্রত্যূষ হইতে নিশীথ পর্য্যন্ত খোলা থাকে।"

মহাপ্রভু "তথাস্তু" বলিলেন। আর বলিলেন "এ তো" আমার জন্য বর মাগিলে, তোমার নিজের জন্য একটা বর প্রার্থনা কর।" রাজাটী নিতান্ত আহাম্মক ছিলেন। তিনি স্বয়ং ভগবান্‌কে সাক্ষাৎ পাইয়া নিজের মুক্তিলাভ পর্য্যন্ত যে কোন ভাল বর মাগিতে পারিতেন; অগত্যা যে পুত্রলাভ-কামনায় ২১ দিনের পূর্ব্বে তিনি মন্দিরের দরজা খুলিয়া ফেলি-লেন অন্ততঃ সে বরটাও চাহিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি চাহিলেন তাহার ঠিক বিপরীত বর। "আমার পরে আমার বংশে যেন কেহ আর না জন্মে।" এইরূপে রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন নির্ব্বংশ হইলেন।

হাণ্টার (W. W. Hunter) সাহেব অনুমান করেন, উল্লিখিত গল্পের শেষ অংশ খৃষ্টীয় ৩১৮ হইতে ৪৭৩ সন অর্থাৎ উড়িষ্যার যবন-অধিকারের সময়ের ঘটনা অবলম্বনে রচিত হইয়াছে। কিন্তু জগন্নাথের বর্ত্তমান মন্দির খৃষ্টীয় ১১৯৮ সনে নির্ম্মিত হইয়াছে। ১১৭৪ খৃষ্টাব্দে মহারাজা অনঙ্গভীমদেব গজপতি উড়িষ্যার রাজা হন। তাঁহার রাজ্য উত্তরে ভাগীরথী, দক্ষিণে গোদাবরী, পশ্চিমে সোনপুর ও পূর্ব্বে বঙ্গোপসাগর

পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই সুবিস্তীর্ণ রাজত্ব তিনি জরিপ করিয়া তাহার দুই-তৃতীয়াংশ ব্রাহ্মণ ও সৈন্যদিগের ভরণ-পোষণের জন্য নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়া বাকী একতৃতীয়াংশের কর-গ্রহণ করিতেন। কিন্তু তিনি হঠাৎ একটী ব্রহ্মহত্যা করিয়া ফেলেন, সেইজন্য তাঁহার অবশিষ্ট জীবন সেই পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য অতিবাহিত হয়। তিনি সেই পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য দেবতার উদ্দেশ্যে ৬০টী প্রস্তরমন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। দশটা বড় বড় নদীর উপর সেতু নিম্মাণ করেন। ১০টী পাকা বড় বড় কূপ খনন করেন। নদীতীরে ১৫২টা ঘাট বান্ধাইয়া দেন। ৪৫০টী "ব্রাহ্মণ-শাসন"* স্থাপন করেন। আর কৃষকদিগের শস্যরক্ষার জন্য পুষ্করিণী কাটাইয়াছিলেন।

একদিন মহাপ্রভু জগন্নাথ তাঁহাকে স্বপ্নে দর্শন দিয়া পুরীতে যাইবার জন্য আদেশ করেন। রাজা তদনুসারে তাঁহার রাজত্বের দ্বাদশ বৎসরে পুরী যাত্রা করেন। পুরীতে গিয়া মহাপ্রভুর পূজা করেন। পরে সেখানে তাঁহার রাজত্বের করদ রাজা, প্রজা ও মন্ত্রীদিগকে ডাকাইয়া বলেন "হে রাজন্যবর্গ! আমার অনেকগুলি টাকা মজুত আছে। আমি যে সকল জাতিকে পরাজয় করিয়াছি, তাহাদের নিকট হইতে নগদ

* ব্রাহ্মণদিগের বাসের জন্য যে নিষ্কর গ্রাম দান করা যায় তাহাকে "শাসন" বলে।

৪০লক্ষ সুবর্ণমুদ্রা ও ৮ লক্ষ সুবর্ণমুদ্রা মূল্যের রত্ন-আভরণাদি গ্রহণ করিয়াছি। এখন আমার ইচ্ছা হইতেছে, এই টাকাগুলি দিয়া জগন্নাথ মহাপ্রভুর একটী মন্দির নির্ম্মাণ করি। ইহার চেয়ে এই অর্থের আর কি উত্তম ব্যবহার হইতে পারে? রাজার কথা শুনিয়া সকলে সাধুবাদ করিলেন। এইরূপে প্রায় ১৫ লক্ষ সুবর্ণমুদ্রা ব্যয়ে (যাহা এখনকার প্রায় পাঁচলক্ষ পৌণ্ড হইবে) শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের বর্ত্তমান মন্দির নির্ম্মিত হইল। মন্দির-নির্ম্মাণে প্রায় ১৪ বৎসর লাগিয়াছিল। ১১৯৮ খৃষ্টাব্দে উহা শেষ হয়।

কৃষক ও পলিটিসিয়ান্

নাজিরাবাদ জেলার বিরাট রাজনৈতিক সভার সভাপতি মিঃ ধুন্ধুমার তাঁহার দুইঘণ্টাব্যাপী ওজস্বিনী বক্তৃতা শেষ করিয়া সভ্যমণ্ডলীর তুমুল করতালি-কোলাহলের মধ্যে বসিয়া পড়িলেন। তখন তাঁহার ঘর্ম্মাক্ত চক্ষুর্দ্বয় হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইতেছিল, তাঁহার বিরল-কেশ মস্তকের মধ্যে যেন প্রবল ঝড় বহিতেছিল। তিনি পকেট হইতে শুভ্র, সুগন্ধি-মাখা রুমাল বাহির করিয়া কপাল ও মুখ মুছিতে লাগিলেন এবং তাঁহার চতুঃপার্শ্ব হইতে ব্যজন আরম্ভ হইল।

এবার উদ্যোগকর্ত্তৃগণের সাধুচেষ্টায় অনেকগুলি কৃষক এই মহতী সভার শোভাবর্দ্ধন করিয়াছিল। কিন্তু বসিবার স্থানের অভাবহেতু তাহারা সভামণ্ডপের বাহিরে দাঁড়াইয়া বক্তৃতা শুনিতেছিল। করতালির চটাপট্ শব্দে তাহাদের মধ্যে একজন সভয়ে সেই সভামণ্ডপের উপরে দৃষ্টিপাত করিয়া অন্যকে বলিল "মেয়া ভাই! ও কিয়ের শব্দ? শিল পরে না ত? আমার তরমুজের খ্যাত বুজি গরাপ অইল!"

"না—ও শিল না, ও হাততালি দেয়।"

"ক্যান্?"

"ওর গো মনে খুব ভারি আহ্লাদ অইছে, হেয়ার লাগিয়া হাততালি দেয়।"

"আচ্ছা-মেয়া ভাই, ঐ দারিওয়ালা মশায় হাত নারিয়া সওয়াল জব করিল সে কোন্ হাকিমের কাছে? কৈ কোন হাকিম ত এহানে দেহি না?"

"হাকিম এহানে আহে নাই—ওনার এই হগল সওয়াল জব খোদ বর লাট সাহেবের দরবারে লেখা পাঠান হবে।"

খোদ বড়লাটসাহেবের নাম শুনিয়া প্রথম বক্তা এনাতুল্লা বিস্ফারিত নেত্রে সভাপতির দিকে তাকাইয়া কহিল—"সাবাস বাপের বেটা! মুখ দিয়া যেন খই ফোটে!"

এই সময়ে সভাভঙ্গের উদ্যোগ হইল। সভাপতি মহাশয় গাত্রোত্থান করিয়া বাহিরে আসিবার উপক্রম করিলেন। তখন সেই কৃষকদল তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাড়াইয়া তাঁহার গতি-রোধ করিল। একজন মাতব্বর সভাপতিকে বলিল—

"বাবু, আমাগো সেই কথাডার কি অইলো?"

সভাপতির একজন পারিষদ অমনি বলিলেন "কিরে বেটা চাষা! বাবু—তোর বাবু কে? ইনি হইতেছেন মিষ্টার।"

মাতব্বর দেরাস্তুল্লা খাঁ যোড়হস্তে সবিনয়ে বলিল "তা আমরা চাষা নোক—আপনারা কলম ধরেন আমরা নাঙ্গল ধরি—আমরা হে কথা—কি রকমে জানমু? (সভাপতিকে)

মাষ্টের মশায়! আপনিত উঠিয়া চল্লেন, আমাগো কি কইয়া যান ?"

সভাপতি মহাশয় একটু থামিয়া বলিলেন "কি শুনিতে চাও?"

দেরা—এই যে দুই দিন আমরা চাষবাস ছারিয়া এহানে আইয়া সোটেলে খাইয়া আপনাগো সভায় হাজির আছি, আমাগো ক্যান্ তলব করছিলেন তা'ত কিছুই বোল্লেন না। ঐ যে একজন কালা রঙের বাবু—তেনার নামডা যেন কি—আরে—আটাত্তর বাবু, আটাত্তর বাবু—তানি আ'জ এক মাস অইল গ্রামে গ্রামে ঘুরব্যা আমারগো কইলেন—তোমাগো চৌকীদারী ট্যাকসো মাফি হবে—জলকষ্ট নিবারণ হবে—ফুলিসির অতি-আচার বারণ হবে—এই রকম আরও কত কথা কইলেন—হেয়া আমরা সগল বুজতেও পারি না। তেনার কথা শুন্যা আমরা পাশ্ শো মানুষ আইছি—সোটেলে এই দুইদিন খাইচি,—সোটেলে জাগা না পায়্যা গাছতলায় শুইছি, এহন্ আমার গো সেই কথার কি করলেন ? আমরা হুনছি আপনি খুব বড় মানুষ—লাট সাহেবের সাতে আপনি কথা কন—আপনার ছিরি মুহের এট্টা বাণী হোনবার জন্তি আমরা আছি।

সভাপতি। বেশত—তোমরা এসেছ, খুব ভাল হয়েছে।

সোটেল—হোটেল।

তোমাদের দেখে আমি খুব খুসী হয়েছি। তোমরা আসাতে আমাদের এই সভার গৌরব বৃদ্ধি হয়েছে।

দেরা।—কিন্তু মাষ্টের মশায়, ক্যাবল কথায় চিরা ভেজে না—এহন সেই কাজের কি অবে?

সভাপতি। - এখানে কোন কাজ হয় না—এখানে কেবল কথা হয়। আমরা যে সকল রিজলিউসন্ অর্থাৎ মন্তব্য পাশ করিলাম সেগুলি স্বয়ং লাটসাহেবের কাছে পাঠান হবে। তিনি আবার কালেক্টর সাহেবের কাছে হুকুম পাঠাবেন। পরে তোমাদের চৌকাদারা ট্যাক্স মাপ হবে—পুকুর কাটা হবে—রাস্তা প্রস্তুত হবে—পুলিসের অত্যাচার নিবারণ হবে।

দেরা। আর আমরা যে ট্যাহা দিছি হে ট্যাহায় কিছু অবে না?

সভাপতি। যে সব চাঁদা আদায় হয়েছে তা'দিয়া এই সভার ব্যয়-নির্ব্বাহ করা হবে। দেশ-বিদেশ থেকে যে সব সভ্য এসেছেন, তাঁহাদের খাওয়ান হচ্ছে।

দেরা। আর আমরা বুঝি ট্যাহা দিয়া চোরের গরু চুরি করছি? এহন গাটির পয়সা খরচা কর‍্যা আবার সোটেলে খামু?

এই সময় আর একজন কৃষক মাতব্বরকে বলিল "ক্যামন্ বর মেয়া? তুমি না কইছিলে দশ হাজার ট্যাহা চাঁদা ওঠ্ছে, ইহার মধ্যি আমার গো পাচ গ্রামে পাচটা পুষ্কণীর জন্যি

পাচ হাজার ট্যাহা দেবে? ট্যাহা নেওয়ার জন্যি ছালা ত আনছিলে হে ছালা কই? ঐ শোনো এহন কি কয়।"

মাতব্বর কিঞ্চিৎ রুষ্টভাবে সভাপতিকে বলিল—"বাবু, আপনারা এই চাঁদার ট্যাহা এই রকম উরাইয়া দিলেন, আমাগো হাতে দিলে আমরা হ্যা দিয়া অনেক কাজ কর্ত্তাম। আর হেই আমোদ কর্যাই যদি খরচ করলেন, তবে আমরা কি চোর অইলাম? আপনারা হ্যার কিছু ট্যাকা দিয়া যদি গাজীর গীত দিতেন, তবে আমরাও হেই আমোদের ভাগ পাইতাম। এখন হোটেলওয়ালার ট্যাহাডা কেডা দেয়? হে আমাগো কাণ ধর্যা পয়সা আদায় কর্যা ছারবে।"

সভাপতি।—টাকা তোমরাই দিবে। আমরা আমাদের নিজের কাজ ক্ষতি করিয়া তোমাদের এই উপকার করিতে আসিয়াছি, ইহাই যথেষ্ট। এই দেখ কত দেশবিদেশ হইতে শত শত ভদ্রলোক মিলিত হইয়াছেন—দেশের জন্য ইঁহারা প্রাণপণে পরিশ্রম করিতেছেন—

দেরা।—বাবু, বেশী বক্‌বেন না—এই যে নেংটীপরা দেরাস্ তুল্লারে গ্যাহেন—এ যদি মনে করে তবে খোদার কছমে এক দিনের মধ্যে এক লাক মানুষ জর করবার পারে। আমি যদি মনে করি তবে দশ দিনের মধ্যি দশ আজার ট্যাহা চাঁদা তোলবার পারি। তবে আমরা মুরুখ্যুনোক—চাষা, আপনারা

ভদ্রলোক, হ্যাহাপরা জানেন। আপনারা আমাগো চালালিই আমরা চলতে পারি। আপনারা তা করেন না এই ত দুঃখু। হ্যাশের জন্যি আপনারা পরিছেরম করেন কইলেন; হে কি পরিছেরম আমরা ত দেহি না, আপনারা ক্যাবল জাগায় বইস্যা কথা কন আর পান তামাক খান।

আর একজন কৃষক বলিল—"তামাক না চুরট্;"

দরো। হয়—হয়—চুরট্। আমরা চাষালোক তামাক খাই, ভদ্রলোকে খায় চুরট্।

সভা।—আমরা সভায় যে কি কাজ করিলাম, তোমরা মূর্খলোক তার কি বুঝিবে? আমরা সভায় যে সব মন্তব্য পাশ করিলাম তাহা লাট সাহেবের কাছে গেলে তোমাদের খুব ভাল হবে।

দেরা। বাবু, হে ত দরখাস্ত। হেয়া ত আমরাই কর্ত্তাম পার্ত্তাম! হেই দরখাস্তের জন্যি এত ট্যাহা খরচ ক্যান্ করলেন?

সভাপতি।—তোমাদের দরখাস্ত ত কেউ শোনে না!

দেরা।—ক্যান্ হোন্‌বে না? আমরা যদি দশ বিশ আজার মানুষ জুটা কেলেক্টার সাহেবের কাছে দরখাস্ত করি, তবে তানি আলবত্ আমাগো দরখাস্ত হোন্‌বেন। আপনাগো কথাই কেউ হোনে না; আপনারা উকীল মোক্তার—যে ট্যাহা দেয় তারই গুণ গান করেন—ট্যাহার জন্যি

কালা গরুরে ধলা বানান—আপনাগো কথায় লাট সাহেব বিশ্বাস করবেন ক্যান্‌ ?

মাতব্বরের এই বক্তৃতা শুনিয়া সভাপতি মহাশয় বিলক্ষণ বিরক্ত হইয়া সবেগে জলযোগগৃহের দিকে প্রস্থান করিলেন। তাঁহাকে রণে ভঙ্গ দিতে দেখিয়া সেই সকল চাষা লোক "আল্লা,—মমিন !" বলিয়া ডাক ছাড়িল। দেরাস্‌তুল্লা তাহাদিগকে থামাইয়া দিল। পরে সেই কৃষককুল কোনক্রমে "সোটেলের" দেনা পরিশোধ করিয়া সেই দিনই স্ব স্ব গৃহে ফিরিয়া গেল। তাহাদের এই মহাসভা সম্বন্ধে দুইটি স্মৃতি মানসপটে অঙ্কিত হইরা রহিল ; সেই শিলপড়ার মত চটাপট্‌ করতালিধ্বনি আর সভাগতি মহাশয়ের তালে তালে পদ-বিক্ষেপ।

আমার শিকার।

সে আজ একুশ বৎসরের কথা। আমি সেবার মেদিনীপুর হইতে কার্ত্তিক মাসে আবার উড়িষ্যার বন্দোবস্ত-কার্য্যে বদলী হইলাম। মিঃ—খোড়দা মহকুমায় একরাজাত মহালের বন্দোবস্ত কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলেন, তিনি পুরীর কালেক্টর হইয়া গেলেন। সেই বন্দোবস্ত কার্য্যের ভার পড়িল আমার উপর।

একরাজাত মহালটি শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সম্পত্তি। খোড়দা মহকুমাটির সমস্ত গবর্ণমেণ্টের খাস মহাল—তাহার মধ্যে জগন্নাথ মহাপ্রভুর এই সম্পত্তিটুকু বিশাল সমুদ্রবক্ষে কয়েকটি দ্বীপপুঞ্জের ন্যায় ভাসমান। এই খোড়দা খাস মহাল ও একরাজাত মহালের ছোট খাট একটি ইতিহাস আছে। যদি পাঠকবর্গের ধৈর্য্যচ্যুতি না জন্মে, তবে একনিঃশ্বাসে তাহা এখানে বলিয়া ফেলিতে পারি।

১৮০৩ খৃষ্টাব্দে যখন ইংরেজ মান্দ্রাজ হইতে চিল্‌কা হ্রদের উপকূল দিয়া উড়িষ্যায় প্রবেশ করেন, তখন উড়িষ্যা দেশ মারাঠা শাসনকর্ত্তাদিগের এলাকা ছিল। তাঁহাদের অধীনে আবার উড়িষ্যায় অনেকগুলি ছোট বড় রাজা ছিলেন। ইংরেজের আগমনবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া তাঁহারা সকলেই ভয়ে জড়সড়

হইয়া ইংরেজের অধীনতা স্বীকার করিলেন। কেবল করিলেন না খোড়দার মহারাজা (বা পুরীর মহারাজা)। তাঁহার যে ততদূর সৈন্যবল ছিল কিম্বা তিনি যুদ্ধবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিলেন, তাহা নহে। তাঁহার মন্ত্রীরা তাঁহাকে বুঝাইয়া দিল যে, তাঁহার তীরধনুকধারী বন্য অসভ্য সৈন্যগণ দেখিয়া ইংরেজ ভয়ে পলাইয়া যাইবে। তিনি সেই সুবুদ্ধি মন্ত্রিবর্গের কথায় বিশ্বাস করিয়া ইংরেজের সহিত যুদ্ধ করিতে চাহিলেন। তাহার ফল এই হইল যে, ছেলের হাতের মোয়ার ন্যায় ইংরেজ তাঁহার রাজত্বটুকু কাড়িয়া লইলেন। আর অন্যান্য যে সকল রাজা বিনা যুদ্ধে ইংরেজের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের নিকট হইতে বৎসর বৎসর কয়েক হাজার কড়ি করস্বরূপ গ্রহণ করিবেন স্থির করিয়া, তাঁহাদিগকে নিজ নিজ রাজ্যে বহাল রাখিলেন। ইঁহারাই হইলেন উড়িষ্যার Tributary Chief বা গড়জাতের রাজা।

খোড়দার মহারাজার রাজ্য গ্রাস করিয়া গবর্ণমেণ্ট তাহা একটি মহকুমায় পরিণত করিলেন। মহারাজা পুরীতে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এই রাজা আবার জগন্নাথদেবের সেবাইত। সেই সূত্রে উড়িষ্যা, মান্দ্রাজ ও অন্যান্য দেশের রাজগণ এক সময়ে ইঁহার অধীনতা স্বীকার করিতেন। এই-জন্য পুরীর মহারাজার উপাধিটি বিলক্ষণ লম্বা, যথা—"বীরশ্রী-

গজপতি গৌড়েশ্বর নবকোটি কর্ণাটোৎকলবর্গেশ্বর বীরাধিবীর-বরপ্রতাপ শ্রীশ্রীশ্রীশ্রীশ্রী অমুক মহারাজা।” এখনও পুরীর মহারাজা উড়িষ্যা ও মান্দ্রাজের রাজাদিগকে গবর্ণমেণ্টের ন্যায় উপাধি প্রদান করেন। গবর্ণমেণ্টের দরবারে ও উড়িষ্যার রাজাদিগের মধ্যে ইঁহার প্রথম আসন। যাহা হউক রাজার ত রাজ্য গেল, এখন জগন্নাথদেবের সেবা পূজা করে কে? কাজেই গবর্ণমেণ্ট বাধ্য হইয়া তাঁহার সেবাপূজা চালাইবার জন্য বৎসর বৎসর পুরীর রাজার হস্তে ৬০ হাজার টাকা দিতে স্বীকার করিলেন। গবর্ণমেণ্টও আবার পূর্ব্বপ্রচলিত প্রথা অনু-সারে পুরীর যাত্রীদিগের নিকট হইতে একটা ট্যাক্স (pilgrim tax) গ্রহণ করিতে লাগিলেন। ১৮০৮ সনে এই রকম বন্দো-বস্ত হইল, এবং কতক বৎসর পর্য্যন্ত এইরূপ কাজ চলিতে লাগিল। পরে এক গোল বাধিল। ইংরেজ-রাজত্বের অভ্যু-দয়ে যে সকল খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রচারক এ দেশে আলোক বিতরণ ও ধর্ম্ম-প্রচার করিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহারা দেশে ফিরিয়া গিয়া এক আন্দোলন উপস্থিত করিলেন। “কি সর্ব্বনাশ। আমরা যে পৌত্তলিকতার দমন করিতে চেষ্টা করি, ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট নিজেই টাকা দিয়া তাহার পোষকতা করিতেছেন! আমাদের চেষ্টা বৃথা!” এই কথা শুনিয়া ইংরেজ জাতি খেপিয়া উঠিল। তখন গবর্ণমেণ্ট সাপও মরে, আর-লাঠি-ও-না-ভাঙ্গে রকমের

এক ফিকির করিলেন। জগন্নাথদেবের সেবাপূজার জন্য প্রথমতঃ ৬০ হাজারটাকা বরাদ্দ হইয়াছিল বটে, কিন্তু কালক্রমে তাহা কমিতে কমিতে ২৩ হাজারে নামিয়াছিল, আর যাত্রীর উপর করও উঠিয়া গিয়াছিল। গবর্ণমেণ্ট খোড়দা খাসমহাল হইতে সেই বার্ষিক ২৩ হাজার টাকা আয়ের উপযুক্ত কতকগুলি মৌজা জগন্নাথের সেবা-পূজার জন্য রাজার হাতে দিয়া পৌত্তলিকতার অপবাদ হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিলেন। এইরূপে ১৮৪০ সনে একরাজাত মহালের সৃষ্টি হইল।

যাক্ সে সব পুরাতন কথা। আমি মেদিনীপুর হইতে কটকে পঁহুছিয়া এই একরাজাত মহালের বন্দোবস্ত-কার্য্যের ভার পাইলাম। কিছু দিন পরে কাগজপত্র, তাঁবু প্রভৃতি লইয়া খোড়দা আসিলাম। মিঃ—যেখানে শেষ কাজ করিয়া গিয়াছিলেন, আমি সেই গ্রামে গিয়া "ডেরা পকাইলাম।" (১) সে গ্রামটির নাম হাড়পদা। তাহার নিকটে এখন মান্দ্রাজ-কটক-রেলওয়ের একটি বড় ষ্টেশন হইয়াছে, নাম নারায়ণগড়। আমরা যখন সেখানে যাই, তখন রেলের রাস্তা কেবল প্রস্তুত হইতেছে, মধ্যে মধ্যে (ব্যালাষ্ট গাড়ী) চলিতেছে; আর গ্রামের আবালবৃদ্ধবনিতা দলে দলে রাস্তার ধারে আসিয়া হাঁ করিয়া তাহা দেখিতেছে, কেহ বা সভয়ে দণ্ডবৎ করিতেছে।

(১) তাঁবু ফেলিলাম।

খোড়দা পাহাড় ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ। প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই দুই একটি ছোট ছোট পাহাড় আছে, সেগুলিকে "মুণ্ডিয়া" বলে। তাহার কোনটার উপরে গাছপালা আছে, কোনটা টাকপড়া মাথার ন্যায় একেবারে খালি। এই পাহাড়-গুলি প্রস্তরময়, ইহার একটিও চট্টগ্রামের পাহাড়ের ন্যায় কেবল মাটীর ঢিপি নহে। তবে কোন পাহাড়ের প্রস্তর খুব শক্ত কাল, তাহাকে "অকস্মাশিলা" বলে; আর কোন পাহাড়ের প্রস্তর লালবর্ণ, (গৈরিক) বেশী কঠিন নহে। খোড়দা অঞ্চলে প্রায়ই কাল মাটি দেখিতে পাওয়া যায় না—অনেক গ্রামের মধ্যে কেবল লালমাটি ও পাথর। শাকসব্জীর বাগান করিতে হইলে অন্য স্থান হইতে কাল মাটি আনিয়া ফেলিতে হয়, তাহার উপর গাছ লাগান হয়। হাড়পদা গ্রামে আমাদের তাঁবুর খোঁটা-গাড়া কঠিন হইয়া উঠিল। অনেক খোঁটা ভাঙ্গিয়া গেল, মাটিতে বসিল না। অবশেষে এক জন "বঢ়ই"-(সূত্রধর)-এর শরণা-পন্ন হওয়া গেল। তাঁহার সহায়তায় কোনক্রমে সেই কাপড়ের ঘর প্রস্তুত করিয়া আমরা তাহার মধ্যে বাস করিতে লাগিলাম।

মেদিনীপুরে এক জন বন্ধুর নিকট হইতে একটি বন্দুক কিনিয়াছিলাম। বনজঙ্গলের কাছে কাপড়ের ঘরে বাস করিতে হইবে, স্থানে-স্থানে বাঘ-ভালুকের ভয়ও আছে, এইজন্য সেই বন্দুকটা সঙ্গে আনিয়াছিলাম। কিন্তু কেবল বন্দুক সঙ্গে থাকি-

লেই ত বাঘ-ভালুক আমাকে ভয় করিবে না? একটু শিকার শিখিবার সখ হইল। কিন্তু শিকার করিব কি? কোন পশু কিংবা পক্ষী? তাহাদের অপরাধ? সখের শিকার করিব আমি, আর মরিবে তাহারা এটা ভাল কথা নয়। সেইজন্য দিন কতক আমগাছের উপর চাঁদমারি করিতে লাগিলাম। কিন্তু তাহাতে বিপদ আছে। গুলি যদি আমগাছে না লাগিয়া কোন লোকের গায় লাগে, তবে উপায়? একদিন প্রাতঃকালে বন্দুক লইয়া হাড়পদা গ্রামের একটি "মুণ্ডিয়ার" দিকে চলিলাম। মতলব এই যে, সেই পাহাড়টির গায় চাঁদমারী করিব, তাহাতে কোন বিপদের আশঙ্কা নাই; আর আমগাছে বন্দুক মারিলে সব গুলি কিছু গাছে লাগে না (আমার হাত এমনি ঠিক!) কিন্তু পাহাড়ের গায়ে গুলি ছাড়িলে তাহা না লাগিয়া যায় কোথায়?

আমার অঙ্গে একজন বন্ধু ছিলেন। আমরা দুই জনে সকালে শীতে কাঁপিতে কাঁপিতে (খোড়দা অঞ্চলে বড় শীত পড়ে), আমার কোটের পকেটে কতকগুলি টোটা পুরিয়া নিয়া সেই মুণ্ডিতমুণ্ড "মুণ্ডিয়ার" দিকে চলিলাম। তবে মুণ্ডিয়াটি একেবারে মাথা-কামান নহে, তাহার শিরোভাগে একটি তেঁতুল গাছ বিরাজ করিতেছিল। আমরা সেই পাহাড়ের নিকট গিয়া তাহাকে লক্ষ্য করিয়া দুই একটি গুলি চালাইলাম। আমি আহ্লাদের সহিত জানাইতেছি যে, আমার একটি গুলিও ব্যর্থ

হইল না, অর্থাৎ পাহাড়ের কোন না কোন স্থানে লাগিয়াছিল। আমার সঙ্গের বন্ধুটি এক জন ভাল শিকারী ছিলেন। তিনি পাহাড়ের পাদদেশ হইতে সেই তেঁতুল গাছটিকে লক্ষ্য করিয়া একটি গুলি ছুড়িলেন। সেটা সেই গাছে লাগিল কি না, তাহা দেখিবার জন্য আমারা পাহাড়ে উঠিলাম। পাহাড়টি বেশী উচ্চ নহে, প্রায় ১০০।১৫০ হাত হইবে। উঠিবার বেশ একটি পথ আছে,—সে পথটা খুব ঢালু, এমন কি, গরু-বাছুর সেই পথ দিয়া পাহাড়ের উপর উঠিতে পারে। আমরাও ক্রমে ক্রমে উঠিলাম।

পাহাড়টির চারি দিকে যে ঢালু জায়গা আছে, কৃষকগণ তাহার উপর বাগান করিবার জন্য আম-কাঁঠালের চারা গাছ রোপণ করিয়াছে দেখিলাম। আর গরু-বাছুরে সেগুলি খাইয়া না ফেলে, এইজন্য পাথরের উপর পাথর বসাইয়া চারি দিকে প্রাচীরের মত বেড়া দেওয়া হইয়াছে। আমরা সেই তেঁতুল গাছের কাছে উঠিলাম। দেখিলাম, সেই গুলিটি তেঁতুল গাছে লাগিয়াছে। দেখিয়া বড় আনন্দ হইল। কিন্তু আরও আনন্দ হইল সেই তেঁতুল গাছের পাদদেশে একটি "গুম্ফা" দেখিয়া।

গুম্ফাটি সেই পাহাড়ের মধ্যে কাটা একটি ছোট ঘর (room)। তাহার একটিমাত্র দ্বার, তাহা এক সময়ে একখানা কাষ্ঠের কপাট দিয়া বন্ধ করা যাইত, তাহার চিহ্ন দেখিলাম।

ঘরের মধ্যে আমরা প্রবেশ করিলাম। উহা চতুষ্কোণাকৃতি। মধ্যস্থল ৭৷৷০ হাত দীর্ঘ, ৭ হাত প্রস্থ ও ২৷০ হাত উচ্চ। দরজাটি পূর্ব্বমুখ। ভিতরে দেওয়ালের গায় দক্ষিণ পার্শ্বে একটি বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি খোদিত রহিয়াছে; তাহার উপরে দুই পংক্তি অক্ষর খোদিত, তাহার বাম দিকে একটি চক্র আঁকা। বাম পার্শ্বে মেজের উপরে একটি ছোট চতুষ্কোণের মধ্যে যুগল চরণ সুস্পষ্ট খোদা রহিয়াছে। তাহার ৩/৪ হাত পশ্চিমে একটি ক্ষুদ্র অগ্নিকুণ্ড; উহার ব্যাস ১/২ হাত হইবে। দক্ষিণ পার্শ্বের পশ্চিমকোণে দেওয়ালে প্রদীপ রাখিবার জন্য একটি ছোট গর্ত্ত কাটা। দেওয়ালের স্থানে স্থানে দুই একটি অক্ষর লেখা আছে ও মূর্ত্তি কাটা আছে। প্রবেশের দ্বারটি দুই হাত উচ্চ, ও দুই হাত প্রস্থ।

আমি গুম্ফার মধ্যে বসিয়া পকেট-বুক খুলিয়া এই সকল বিবরণ লিখিয়া লইলাম। বুদ্ধমূর্ত্তির উপরে যে দুই পংক্তি লেখা আছে, ট্রেসিং কাগজ তাহার উপরে ফেলিয়া, তাহার অবিকল প্রতিলিপি আঁকিয়া লইলাম।

এই অক্ষরগুলি দেবনাগর অক্ষরের ন্যায়, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে দেবনাগর নহে। আবার উড়িয়া অক্ষরের সহিত ইহার কোনটার সাদৃশ্য থাকিলেও উহা উড়িয়া নহে। বোধ হয়, পালি অক্ষর হইতে পারে। শেষের দুইটি অক্ষর "গুম্ফা", ইহা স্পষ্ট চেনা যায়, কিন্তু অন্য অক্ষরগুলি পড়া আমার বিদ্যায় কুলাইল না।

গুম্ফার মধ্যে যাহা দেখিলাম, তাহাতে অনুমান হয়, এক জন বৌদ্ধ-সন্ন্যাসী বা ভিক্ষু এই গুহাতে বাস করিতেন। যদি হণ্টার সাহেবের (W. W. Hunter) অনুমান ঠিক হয়, তবে এই গুম্ফাটি যীশুখ্রীষ্ট জন্মিবার প্রায় ৫০০ বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হইয়াছিল। (১)

আমরা গুম্ফার বাহিরে আসিয়া তাহার উপরের দৃশ্য দেখিলাম। গুম্ফার উপরিভাগ সমতল, তাহার স্থানে স্থানে কতকগুলি গর্ত্ত কাটা। বোধ হয়, এই গর্ত্তগুলিতে গুহাবাসী ভিক্ষু তাঁহার ব্যবহারের জন্য বৃষ্টির জল ধরিয়া রাখিতেন। আমি সেখানে তেঁতুল গাছের ছায়ায় পা ঝুলাইয়া বসিয়া চারি

(১) হাণ্টার সাহেব এই সকল গুম্ফাকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া তাহাদের সময় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ১ম, সন্ন্যাসী যুগের গুম্ফা ("ascetic age")—কেবল একটিমাত্র ছোট গুহা, তাহাতে কষ্টে প্রবেশ করা যায়। ২য়, ceremonial ageএর গুম্ফা, খুব বড় প্রকোষ্ঠ, তাহাতে সভা-সমিতির জন্য অনেক লোক সমবেত হইতে পারিত। ৩য়, fashionable ageএর গুম্ফা—দ্বিতল প্রাসাদের ন্যায়। এই সকল গুম্ফা ৫০০ খৃঃ পূঃ হইতে ৫০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে নির্ম্মিত হইয়াছিল। "Their sculptured galleries belong to a more recent date, but even the most elaborate, and probably the most recent of them, cannot be placed after the first Century A, D."—Hunter's Orissa Vol I. p. 178.

দিক দেখিতে লাগিলাম, আর মনে কত কল্পনা করিতে লাগিলাম। তখন সূর্য্যের কিরণ প্রখর হইয়া উঠিয়াছে। যে দিকে তাকাই, প্রকৃতির মুখচ্ছবি উজ্জলবর্ণে আলোকিত। চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত ধান্যক্ষেত্র সকল সুপক্ক ধান্যের সুবর্ণরাগে রঞ্জিত হইয়াছে। আকাশের এক প্রান্তে নীলশৈলমালা উজ্জল নীলাকাশের সহিত মিলিয়া গিয়াছে, অপর প্রান্তে গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ বনরাজি এবং স্থানে স্থানে বিস্তৃত আম্রকানন। মধ্যে মধ্যে ক্ষুদ্র পাহাড়গুলি সেই শস্যক্ষেত্রের মধ্য হইতে যেন মস্তক উত্তোলন করিয়া উঠিয়াছে। প্রকৃতির এই হাস্যমধুর মুখশ্রী দেখিয়া আমি মোহিত হইলাম। আর সুদূর অতীতকালের সাক্ষী সেই বৌদ্ধযোগীর আবাসগৃহ গুম্ফার কথা ভাবিতে ভাবিতে ডেরায় ফিরিয়া আসিলাম। আমার সেদিনকার এই শিকারে যেরূপ আনন্দ হইয়াছিল, একজন প্রকৃত শিকারীর একটা প্রকাণ্ড বাঘ শিকারেও সেরূপ আনন্দ জন্মে কি না সন্দেহ।

বাঙ্গালীর মজলিস্

——জেলায় শরৎবাবু সরকারী উকীল। আজ তাঁহার পৌত্রের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে তাঁহার বাছা বাছা বন্ধুদিগকে একটি সান্ধ্য-ভোজে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। বৈশাখ মাস, রাত্রি ৮টা হইয়াছে। শরৎবাবুর প্রকাণ্ড বাড়ীর উপরতলার হলে একটি ফরাস-বিছানা পাতা হইয়াছে, তাহার উপর অনেকগুলি তাকিয়া। সেখানে নিমন্ত্রিত বন্ধুগণ একে একে আসিয়া উপস্থিত হইতেছেন। টানাপাখা চলিতেছে; থাকিয়া থাকিয়া গোলাপজলের ছিটা দেওয়া হইতেছে; অনেকগুলি রূপা বাঁধা হুঁকায় তাম্রকূট-সেবন চলিতেছে; তাহার সঙ্গে অজস্র পাণ আর গল্পগুজব।

নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকদিগের মধ্যে পাঁচটি উকীল, দুইটি মুন্সেফ্, দুইটি ডেপুটী আসিয়াছেন। আর সকলে ক্রমে আসিতেছেন।

উপস্থিত ভদ্রলোকদিগের মধ্যে এইরূপে কথাবার্ত্তা চলিতেছে।

১ম উকীল। শরৎবাবু, হরিবাবু আসবেন না?

শরৎবাবু। আসবেন্ বই কি? তবে তাঁর আজ প্রথম সবজজবাবুর কোর্টে একটি বড় মোকর্দ্দমা আছে—তাই দেরী

হচ্ছে। হাকিম রাত্রি ৮টা পর্য্যন্ত কাছারি করেন যে! আস্তে আজ্ঞা হয় রমণীবাবু!

ইহা বলিয়া শরৎবাবু উঠিয়া দাঁড়াইয়া রমণীবাবু উকীলকে অভ্যর্থনা করিলেন।

রমণীবাবু। কই, এখনো যে অনেকে আসেন নাই? আমি মনে করেছিলাম আমিই বুঝি খুব late হয়েছি। আমার আজ ম্যাজেষ্ট্রেটের কোর্টে একটি মোকদ্দমা ছিল। তাই দেরী হয়েছে।

ম্যাজেষ্ট্রেটের কথা শুনিয়া একটি ডেপুটী কাণ খাড়া করিয়া উঠিয়া বলিলেন—কি মোকদ্দমা মশাই? কোন আপীল নাকি?

রমণী। আজ্ঞে একটি আপীলের মোকর্দ্দমা। সেই কেফাতুল্লা বাদী, ছলিমদ্দী আসামী ৩৭৯ ধারার মোকর্দ্দমা—আপনাদের বিপিনবাবু আসামীকে ৬ মাস ঠুকিয়া দিয়াছিলেন।

২য় ডেপুটী। আপীলে কি হলো? আসামী খালাস করলেন?

রমণী। না—আপীল ডিস্মিস্ হয়েছে।

১ম ডেপুটী। আমাদের সাহেব কিন্তু বড় Convicting—আপীল অধিকাংশই ডিস্মিস্ হয়।

২য় ডেপুটী। তা জজসাহেবই বা কম কি?

রমণীবাবু। কিন্তু জজসাহেব সব বিষয় patiently শোনেন—একেবারে পত্রপাঠ বিদায় দেন না।

১ম উকীল।—তা' ঠিক—আমি সে দিন একটা মোকর্দ্দমা ২ ঘণ্টা argue করিলাম—তা একটুও বিরক্তি প্রকাশ করিলেন না। Samson সাহেবের আমলে তা' ছিল না। তিনি ঘড়ী খুলিয়া বোস্‌তেন—বড় জোর্ এক কোয়াটার হইলেই বল্‌তেন—sit down Babu.

১ম ডেপুটী। আমাদের ম্যাজিষ্ট্রেট্‌ও প্রায় তথৈবচ। তিনি আধ ঘণ্টার বেশী একভাবে বসিয়া থাকিতে পারেন না—কেবল ছট্‌ফট্ করেন।

১ম মুন্‌সেফ্। (দ্বিতীয় মুন্‌সেফের প্রতি) আচ্ছা আপনার সেই title suitটার আপীলে কি হইল?

১ম উকীল। কিন্তু এ পর্য্যন্ত যত জজ দেখিয়াছি Robinson সাহেবের মত কেউ নয়। তিনি প্রত্যেক বিষয় তন্ন তন্ন করিয়া না বুঝিয়া কোন হুকুম দিতেন না—অসাধারণ patience—তিনি বলিতেন "Either you must convince me or I must convince you"

দ্বিতীয় মুন্‌সেফ। (প্রথম মুন্‌সেফের প্রতি) সে আপীল এখনও নিষ্পত্তি হয় নাই, তার মধ্যে একটা কঠিন কথা পড়েছে—res judicata—argument অনেক দিন হ'য়ে রয়েছে, জজ

রায় দিতে বিলম্ব করছেন। অনেক আইন নজীর ঘাঁটা[illegible]ত হচ্ছে।

যোগেশবাবু প্রফেসরকে আসিতে দেখিয়া শরৎবাবু উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—আস্‌তে আজ্ঞে হউক—এত দেরী যে!

যোগেশবাবু। দেরি কোথায়? আমি জানি বাঙ্গালীর নিমন্ত্রণ ৮টার কথা থাক্‌লে, হয় ১২টায়! (সকলের হাস্য)

প্রথম ডেপুটী। (দ্বিতীয় ডেপুটীর প্রতি) আপনার leaveএর কি হলো? সাহেব ছুটী recommend করেছেন ত?

প্রথম মুনসেফ্ (দ্বিতীয় মুন্‌সেফের প্রতি)। তা'ত বটেই! আপনি যে লম্বা রায় লিখেছেন, তা'তে কত কত authority quote করেছেন; সে গুলি একবার মিলাইয়া দেখিতে কত সময়ের দরকার বলুন দেখি?

১ম উকীল। (দ্বিতীয় উকীলের প্রতি) আপনি সে দিন 15 Calcuttaর যে নজীরটা quote করেছিলেন, আমি তখন তখনই তার reply দিতে পারলাম না বটে, কিন্তু পরে Digest খুলিয়া দেখিলাম যে 20 Calcuttaতে সেটা Full Benchএ over-rule করেছে।

দ্বিতীয় ডেপুটী (প্রথম ডেপুটীর প্রতি)। সাহেব leave recommend করিলে কি হয়; Chief Secretary দিলে ত?

এখন একজন First Class Powerএর officer available হইলে ত ?

২য় মুন্‌সেফ। আমার বিশ্বাস আপীল ডিস্‌মিস্ হবে। এই একটা মোকর্দ্দমাতেই বড় বেশী দিন লেগেছে। সেজন্য আমার এ মাসে disposal বড় কম হয়েছে। হাইকোর্টে গালাগালি দেবে আর কি ?

২য় উকীল। কিন্তু সেই Full Bench decisionএর সহিত আমার সেই caseএর তফাৎ আছে। আপনি সেই nice distinctionটুকু লক্ষ্য করেন নাই।

১ম ডেপুটী। তা' হবে বই কি ? যাহা হউক আমাদের সাহেব কিন্তু leave দেওয়ার সম্বন্ধে বড় ভাল। আমি যখন ভাগলপুরে ছিলাম তখন White সাহেবের underএ কাজ করেছি, তিনি এ বিষয়ে বড় কড়া ছিলেন।

১ম মুন্‌সেফ্। সেই ত কথা! উপরওয়ালারা কেবল কাজের quantityই দেখেন quality ত দেখেন না। তাঁরা কেবল চান disposal—quick—quick—quick—

১ম উকীল। সে nice distinction আর কি ? আচ্ছা আমি আর একবার পড়ে দেখব'।

২য় ডেপুটী। ও—আপনি সেই White সাহেবের কাছে চাকরী করিয়াছেন না কি ? আমি তাঁকে খুব চিনি। আমি

প্রথমে যখন মুঙ্গেরে join করি তখন তিনি সেখানে Joint ছিলেন। বড় খিট্‌খিটে স্বভাব !

২য় মুন্‌সেফ। গত মাসে আমার disposal খুব বেশী ছিল—অন্ততঃ অন্যান্য সব মাসের চেয়ে বেশী, তবুও remark হয়েছিল unsatisfactory.

এসময়ে ব্রজবাবু সবজজ আসিলেন, গৃহস্বামী উঠিয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন। ব্রজবাবু গড়গড়ার নল মুখে দিয়া ২য় মুন্‌সেফ বাবুকে বলিলেন—

"অমরবাবু—কতক্ষণ ?"

"আজ্ঞে—এই দশ মিনিট্। আপনার দেরী হ'লো যে ?"

"আজ একটা বড় মোকর্দ্দমার argument শুন্‌ছিলাম, আচ্ছা, শরৎবাবু আপনি সে caseটা নেন নাই কেন ?

শরৎবাবু। fee বড় কম দিতে চাইল।

ব্রজবাবু। case টা কিন্তু বড় intricate, অনেকগুলি aw points involved রয়েছে—আমাকে অনেক আইন নজীর াঁট্‌তে হচ্ছে। (২য় ডেপুটীবাবুকে দেখিয়া) কি হে হেম-াবু ! তোমার leaveএর কি হলো ?

"আজ্ঞে, আমাদের সাহেব ত recommend করেছেন খন officer available হলে হয়। আমারও এদিকে আদায় উপস্থিত।

ব্রজবাবু। তাইত! বাঙ্গালীর কন্যাদায়ই প্রধান দায়!— এই যে নবীনবাবু আস্‌ছেন!

কেমন আছেন নবীনবাবু?

নবীনবাবু একজন বড় ডাক্তার। শরৎবাবু অমনি উঠিয় দাঁড়াইয়া তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। তিনি কোট-প্যান্ট পরিয়া আসিয়া সেই ফরাস-বিছানার উপর কষ্টেস্থষ্টে বসিলেন শরৎবাবু তাঁহাকে একখানা চৌকীতে বসিতে অনুরোধ করিলেন, কিন্তু তিনি বলিলেন "আমার ঢিলে প্যাণ্ট্‌লেন, কোন কা হবে না।"

নবীনবাবু একজন ভারতহিতৈষী। বাঙ্গালীরা কিসে মানুষ হইবে এই চিন্তায় তাঁহার মস্তিষ্ক সর্ব্বদা আলোড়িত তিনি জুতজাত হইয়া বসিয়া, একটি চুরুট্‌ ধরাইয়া মুখে দিয়া ব্রজবাবুর "কেমন আছেন?" প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন।

"মশাই, বাঙ্গালী আবার কেমন থাক্‌বে বলুন? আ মাথাধরা, কাল ডিস্‌পেপ্‌সিয়া, পরশু ফিবার—এই রকম এক না একটা লাগিয়াই আছে? আর—পরিশ্রম ক'রবে হাড়ভাঙ্গা খাবে কিনা ডাল ভাত। লোকে ডালভাত খেয়ে কয় দি বাঁচ্‌তে পারে? ভাতে Substance কিইবা আছে বলুন হাইড্রোজেন—ষ্টার্চ—স্থগার এই সবই বেশী। ইহা খাইয়া কখনও মানুষ বাঁচে? আমি একথা বরাবর বলে আস্‌ছি

বাঙ্গালী meat খাওয়া অভ্যাস না করলে কখনও মানুষ হবে না!

ব্রজবাবু। কিন্তু এই গ্রীষ্মপ্রধান দেশে meat সহ্য হবে কেন?

নবীনবাবু। হবে না কেন? আপনি পরিশ্রম করবেন না, সারাদিন তাকিয়া ঠ্যাসান দিয়া ফরাশ-বিছানার উপর পড়ে থাকবেন আর গুড়গুড়ী টান্‌বেন, ইহাতে হজম হবে কি? কাজেইত ডিস্‌পেপ্‌সিয়া, Diabetis এই সকল রোগ ধরে। একবার সাহেবদের মত ব্যায়াম করা অভ্যাস করুন—tennis, cricket, foot-ball, golf এসব অভ্যাস করুন, দেখবেন যা খাবেন তাই হজম হবে—ব্যারাম-সেয়ারাম কাছেও ঘেঁস্‌তে পারবে না। কিন্তু একথা শোনে কে? বাঙ্গালী জাতির আর উদ্ধার নাই—

নবীনবাবুর এই বক্তৃতা শুনিয়া ব্রজবাবু ও শরৎবাবু ভিন্ন আর সকলেই একটু একটু মুচকি হাসিতেছিলেন। এমন সময়ে কমিশনারের Personal assistant সারদাবাবু আসিলেন। শরৎবাবু যথারীতি অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাকে বসাইলেন।

নবীনবাবুকে লক্ষ্য করিয়া তখন ব্রজবাবু বলিলেন। "মশাই আপনি যা বল্লেন তা ঠিক, কেবল শারীরিক পরিশ্রম না করার দরুণই আমরা রোগে ভুগি। কিন্তু meat খাওয়াটা

আমাদের দেশে একান্ত আবশ্যক তাহা স্বীকার করি না। এই দেখুন না পশ্চিমে-লোক সব”—

নবীনবাবু উত্তর দিতে যাইতেছিলেন, এমন সময়ে সারদা বাবু বলিলেন—

“কমিশনারসাহেব”—

নবীনবাবু তাঁহার কথায় বাধা দিয়া বলিলেন।

“বটে ? পশ্চিমেলোক কি খুব সবল আপনি মনে করেন ? তা কখনই না। হবে কি করে ? তারা মাংস খায় না—সবল হবে কি করে ?”—

সারদাবাবুর স্বভাব এই তিনি যেখানে উপস্থিত হইবেন, সেখানে আর কেহ মুখ খুলিতে পারিবে না। আর তিনি কমিশনারের পার্শনাল এসিসট্যাণ্ট তিনি যাহা বলিবেন তাহা সকলে মনোযোগ দিয়া শুনিতে বাধ্য। তাই তিনি কথার গতি কমিশনারের দিকে ফিরাইবার জন্য আবার বলিলেন—

“কমিশনার সাহেব”—

কিন্তু নবীনবাবুও নাছোড়বান্দা। তিনি তাঁহার কথা ছাড়িবেন কেন ? তাই তিনি বলিতে আরম্ভ করিলেন—

“অমি আবার বলিতেছি—মাংস না খাওয়া বাঙ্গালীর একটা national vice—মাংস না ধরিলে আর বাঙ্গালীর উদ্ধার নাই”—

হাস্যরসিক ব্রজবাবু শরৎবাবুকে বলিলেন।

"শরৎবাবু—আজ নবীনবাবুকে খুব বেশী করিয়া মাংস দিবেন। উনি একবার বলসঞ্চয় করিয়া আমাদিগকে দেখান যে বাঙ্গালী মানুষ—"

কি বিপদ! সারদাবাবু ৩ মিনিট আসিয়া বসিয়াছেন, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত একটা কথাও বলিবার অবকাশ পাইলেন না। তাঁহার দম আট্‌কিয়া আসিতেছে। সৌভাগ্যক্রমে নবীনবাবু ডাক্তার মিউনিসিপালিটীর Vice-Chairman, সেই সূত্রে তাঁহাকে পাকড়াইয়া আবার কমিশনারের কথা আরম্ভ করিলেন—

"নবীনবাবু! কমিশনার সাহেব আপনাদের মিটিংএর সেই resolution পড়ে কি বলেছেন জানেন?"

নবীনবাবু। কি? বলুন না—

সারদাবাবু। তিনি কোন ক্রমেই budget এর সেই Item মঞ্জুর করবেন না। সে resolution reconsider করিবার জন্য আবার ফেরত পাঠান হবে।

নবীনবাবু। তা তিনি যাহা ভাল বুঝবেন তাই করবেন—আর আমরাও যাহা ভাল বুঝব তাই করিব।

এইরূপে কথা চলিতে লাগিল। যোগেশবাবু প্রফেসর এতক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়াছিলেন, একটি কথাও বলেন নাই।

তিনি পার্শ্বস্থ একটি উকীলকে বলিলেন, "মশাই—এ shop-talking ত আর সহ্য হয় না। আপনি একটা গান ধরিয়া দিন আমি এই হার্ম্মোনিয়ামটা বাজাই। কিন্তু যোগেশবাবু হার্ম্মোনিয়মে সুর দিতেই সারদাবাবু তাঁহার পসার মাটি হয় বলিয়া এবং নবীনবাবু তাঁহার ভারতোদ্ধারের কথা চাপা পড়ে বলিয়া, কিঞ্চিৎ অমত প্রকাশ করিলেন। যোগেশবাবু সেই বাধা না মানিয়া তাঁহার স্বরচিত এই গানটি ধরিয়া দিলেন—

এই কি সময় ওহে মহাশয়
কহিতে আফিসের কথা।
জজ-ম্যাজিষ্টার আর কমিশনার
মুন্‌সেফ ডেপুটার একমাত্র সার
আইন-নজীর উকীলের পসার
বল আমরা যাই কোথা॥
বাঙ্গালীর বিদ্যা কলেজ ছাড়িলে,
চর্চ্চার অভাবে সবে যায় ভুলে,
সদা তার মন আফিসে মগন
সপ্‌-টকিং যথা-তথা॥

উড়িষ্যার উপাধিরহস্য

উপাধিগ্রস্ত হওয়ার আকাঙ্ক্ষাটা সকল দেশের লোকের মধ্যেই আছে। কিন্তু উড়িষ্যায় ইহার কিঞ্চিৎ প্রাবল্য দেখা যায়। সমগ্র উৎকলে এমন গ্রাম নাই যেখানে দুই এক জন উপাধিবিশিষ্ট ব্যক্তি পাওয়া না যাইবে; আবার এমন একটি সম্ভ্রান্ত-পরিবার নাই যাহার দুই এক জন ব্যক্তি এই রোগে আক্রান্ত না হইয়াছেন। মোগলবন্দী(১) এলাকার মধ্যে খোড়দহ মহকুমাতে এই রোগটি বিশেষরূপে সংক্রামক বলিয়া বোধ হয়; সেখানে এমন কোন সঙ্গতিপন্ন পরিবার নাই যাহাতে দুই চারি জন "পট্টনায়ক", "শ্রীচন্দন" "হরিচন্দন" "সুন্দর-রা" না মিলিবে। ইহা ছাড়া গড়জাত-প্রদেশে ছোট ছোট রাজাদিগের এলাকায় বারি-ধারার ন্যায় উপাধিবর্ষণ হইয়া থাকে। অন্যত্র, যেগ্রামে আর কিছু নাই, সেখানে দুই চারি জন "মহাপাত্র" অবশ্যই মিলিবে, সে বিষয়ে কিছুমাত্র সংশয় নাই।

এই সকল উপাধির দুই রকমে উৎপত্তি হইয়া থাকে—(১)

---

(১) উড়িষ্যা মোটামুটি দুই ভাগে বিভক্ত। গড়জাত ও মোগলবন্দী। করদরাজাদিগের এলাকা গড়জাত, গবর্ণমেণ্টের খাস এলাকা মোগলবন্দী।

রাজদত্ত উপাধি ও (২) স্বয়ং গৃহীত উপাধি। উপাধি প্রদান বিষয়ে পুরীর মহারাজার অধিকার সমগ্র উৎকলদেশে—কেবল উড়িষ্যায় নহে, যেখানে যেখানে উড়িয়াভাষা প্রচলিত, যায় মধ্যপ্রদেশের অনেক অংশ ও মান্দ্রাজবিভাগের কতকাংশ, সর্ব্বত্র স্বীকৃত ও আদৃত হইয়া থাকে। কারণ এক সময়ে পুরীর মহারাজা উৎকলদেশের নৃপতিগণের সম্রাট্ (Suzerain) ছিলেন—অন্যান্য সকল রাজাই তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিতেন ও কেহ কেহ তাঁহাকে কর প্রদান করিতেন। পুরীর রাজাদিগের মধ্যে মহারাজা প্রতাপরুদ্রের প্রতাপে এক সময়ে ভাগীরথীতীর হইতে গোদাবরী তটপর্য্যন্ত সমগ্র প্রদেশ কম্পিত হইত। সেই সময় হইতেই পুরীর মহারাজার প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। পুরী রাজার সমধিক সম্মানলাভের আরও একটি কারণ আছে। তিনি ৺জগন্নাথদেবের সেবক বা সেবাইত। এই-জন্য তাঁহাকে সাধারণতঃ "চলন্তি বিষ্ণু" অর্থাৎ সচল বিষ্ণু (অচল বিষ্ণু হইতেছেন শ্রীশ্রীজগন্নাথ) এই আখ্যা প্রদান করা হয়। জগন্নাথদেবের সেবাইত বলিয়া পুরী রাজার সম্মান কেবল উড়িষ্যাপ্রদেশে সীমাবদ্ধ নহে, সমগ্রভারতবর্ষের রাজন্যবর্গ তাঁহার নিকট মস্তক অবনত করিয়া থাকেন। সুতরাং পুরীর মহারাজপ্রদত্ত উপাধি সমগ্র উৎকলদেশে স্বীকৃত ও সম্মানিত হইবে ইহার আশ্চর্য্য কি ?

এতদ্ভিন্ন অন্যান্য যে সকল রাজা আছেন তাঁহাদের প্রদত্ত উপাধি কেবল তাঁহাদের নিজ নিজ এলাকাতে স্বীকৃত হয়।

এই ত গেল রাজদত্ত উপাধির কথা ;

এতদ্ভিন্ন স্বয়ংগৃহীত উপাধিও আছে। সে কেমন তাহা বলিতেছি, শ্রবণ করুন। অবশ্য স্বয়ংগৃহীত উপাধির অর্থ ইহা নহে, যে উপাধিগৃহীতা একদিন সকলকে ডাকিয়া বলিবেন "ওহে লোকসকল! আজ হইতে তোমরা আমাকে "হরিচন্দন বা "মর্দ্দরাজ" বলিয়া ডাকিও, নচেৎ তোমাদের—তোমাদের—ভাল হইবে না।" যেমন বাড়ীর সকলে এক জনকে "বড়বাবু" বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে ক্রমে তিনি পাড়ার "বড়বাবু" হইয়া পড়েন ও অবশেষে গ্রামের বড়বাবুও হইতে পারেন, সেই রকম বাড়ীর সকলে কিম্বা আত্মীয়বন্ধুগণে এক জনকে মহাপাত্র বলিয়া ডাকিতে ডাকিতে তিনি সকলের নিকট মহাপাত্র বলিয়া পরিচিত হন ও এমন কি নিজের নাম-দস্তখতের সময়ও সেই মহাপাত্র উপাধি দ্বারা নিজকে ভূষিত করিতে কুণ্ঠিত হন না। ইহাকেই বলিতেছি স্বয়ংগৃহীত উপাধি। তবে ইহা ছাড়া আরও এক রকমের আছে। সাধারণতঃ রাজা ও জমিদার কিম্বা মহাজনের পরিবারে, যিনি বাড়ীর কর্ত্তা তিনি তাঁহার ছোট ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র প্রভৃতিকে এক একটি উপাধি প্রদান করেন। তাহা না হইলে, আর সকলে তাহাদিগকে মানিবে

কেন ? তবে অবশ্য পুরীরাজের নিকট হইতে যদি একটি উপাধি আনান যায়, তবে সেটিই খুব জব্দ রকমের উপাধি হয়। এগুলি তদভাবে "মধ্বভাবে গুড়ং দত্বাৎ" গোছের হইয়া থাকে।

এইরূপে উপাধির উৎপত্তি বর্ণনা করিয়া এখন আমার ইচ্ছা হইতেছে, উড়িষ্যার সচরাচর প্রচলিত উপাধিগুলিকে কোন বৈজ্ঞানিক প্রণালাতে শ্রেণিবদ্ধ (Classification) করিয়া পাঠকবর্গের সম্মুখে উপস্থিত করি। কিন্তু একটা কথা আগেই বলিয়া রাখি—এই উপাধিগুলি দেখিয়া কাহারও মনে যেন লোভের সঞ্চার না হয়।

(১) রাজাদিগের উপাধি—গজপতি, ছত্রপতি, ভূপতি, চক্রনারায়ণ, নারায়ণদেব, বসন্তরায়, ভঞ্জদেব, জয়সিংহ, রণসিংহ, মহীন্দ্রবাহাদুর, চম্পতিসিংহ, মঙ্গরাজ, মান্ধাতা, বীরসিংহ, রাট-সিংহ, গম্ভীরসিংহ, জগদেব, ভ্রমরবর, মর্দ্দরাজ, হরিচন্দন, শ্রীচন্দন, মহারথা, নরেন্দ্রসিংহ, সুরেন্দ্রসিংহ, প্রতাপসিংহ, রাজেন্দ্রসিংহ, চক্রবর্ত্তী, চোহানসিংহ, বাঘসিংহ, মানসিংহ, সুচলদেব, রাজ দেব, দেবরাজা, সামন্তসিঙ্গার, পাইকরায় ইত্যাদি ইত্যাদি।

ইহার মধ্যে কতকগুলি যেমন রাজার প্রতি প্রযুজ্য, তেমন রাজবংশের অন্যান্য ব্যক্তিরা এবং সম্ভ্রান্ত পরিবারের ব্যক্তিরাও ধারণ করিতে পারেন। তবে ক্ষত্রিয় ও খণ্ডাইত জাতি ভিন্ন অন্য জাতি ইহা গ্রহণ করিতে পারে না।

আপনি যদি মনে করেন যে, ইহার কোন একটি উপাধিই একজন রাজার পক্ষে যথেষ্ট, তবে সেটা আপনার মস্ত ভুল হইবে। যিনি পাঁচ ক্রোশ পৃথ্বীর "রাজা" তাঁহার পক্ষেও একটি মাত্র "মহীন্দ্র বাহাদুর" কি "ভূপতি বাহাদুর" উপাধি যথেষ্ট নহে। অনেক সময়ে ইহার দুই বা ততোঽধিক উপাধির সমবায়ে এক একটি রাজার নাম উৎপন্ন হইয়া থাকে।

যথা—বীরবর উপেন্দ্র নরেন্দ্র মহাপাত্র; গজপতি নারায়ণ চন্দ্র ভুপতিবাহাদুর; ধনঞ্জয় মান্ধাতা হরিচন্দন মহাপাত্র ইত্যাদি ইত্যাদি ইত্যাদি।

যত রাজার নাম দেখিয়াছি, তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত নামটিই খুব জবরদস্ত রকমের বোধ হয়, যথা—

রাজা গৌরচন্দ্র মানসিংহ হরিচন্দন মর্দ্দরাজ ভ্রমরবর রায়-বাহাদুর। ইনি কোন দুর্ভিক্ষের সময় প্রজাদিগকে অনেক সাহায্য করাতে শেষের "বাহাদুরটি" গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে লাভ করিয়াছেন—বলা বাহুল্য রাজা উপাধি পূর্ব্বেই পাইয়াছিলেন।

এইত গেল অন্যান্য রাজাদিগের উপাধি। এখন যিনি এই সকল উপাধি দান করিয়া থাকেন, অর্থাৎ পুরীর মহারাজা, তাঁহার উপাধিটা কেমন, একবার দেখিতে চান কি? অবশ্যই যিনি যে বস্তু অন্যকে দান করেন, সেই বস্তু তাঁহার নিজের নিকট

সাধারণতঃ খুব বেশী পরিমাণে থাকিবারই কথা। অতএব একবার ধৈর্য্যাবলম্বনপূর্ব্বক, আপনারা উৎগ্রীব ও উৎকর্ণ হইয়া থাকুন, আমি পুরী মহারাজের নাম-কীর্ত্তন করিতেছি। যথা—

"বীরশ্রী গজপতি গৌড়েশ্বর-নবকোটি-কর্ণাটোৎকলবর্গেশ্বর-বীরাধিবীরবরপ্রতাপ শ্রীশ্রীশ্রীশ্রীশ্রীমুকুন্দদেব মহারাজা।" এই পাঁচটি শ্রী দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন না; কোন কোন রাজার কৌলিকপ্রথা অনুসারে, ৬টা, ৭টা পর্য্যন্তও শ্রী ব্যবহৃত হইয়া থাকে। তাহারা সকলেই খুব শ্রীমন্ত কিনা? যদিও এখন পুরীরাজার এলাকা কেবলমাত্র পুরীজেলার একটি ক্ষুদ্র পরগণার (লেম্বাই) জমিদারীতে সীমাবদ্ধ, তথাচ এখনও এই উপাধিটা পূর্ব্ববৎ কায়েম রহিয়াছে। উড়িষ্যায় কোন তমঃস্থক কিম্বা কবলা লিখিতে হইলে তাহার তারিখ এইরূপে লেখা হয় যথা—বীরশ্রী ... ... মুকুন্দদেব মহারাজের ১০ম অঙ্কে অর্থাৎ রাজত্বের বৎসরে এই দলিল লেখা হইল।

(২) ভদ্রলোকদিগের উপাধি—সামন্ত, সামন্তরায়, সামন্তসিঙ্গার, ভ্রমরবর, মহাপাত্র, রাউতরায়, পাইকরায়, খণ্ডাইতরায়, ছোটরায়, সুন্দররায়, চম্পতি, চৌধুরী, কাননগুঁই, পট্টনায়ক, হরিচন্দন, শ্রীচন্দন, মর্দ্দরাজ, বীরসিং, জয়সিং, পৃথিবীসিং, জেনামণি, মালবেহার, মল্ল, জগদেব, বাঘসিংহ, মানসিং, গুমানসিং, ছোয়ানসিং, রায়, গজেন্দ্র, ইত্যাদি।

ইহার অনেকগুলি আমাদের দেশের রায়চৌধুরী প্রভৃতি উপাধির ন্যায় বংশপরম্পরাক্রমে চলিয়া থাকে।

(৩) পণ্ডিতদিগের উপাধি—পাটযোশী, বাহনপতি, পহরাজ, রাজগুরু, বিদ্যাভূষণ, তর্কভূষণ, সভারত্ন ইত্যাদি।

(৪) রাজকর্ম্মচারীদিগের উপাধি—ছামপট্টনায়ক, ছামকরণ, দেওয়ান, বিষয়ী, ব্যবর্ত্তা (=ব্যবহর্ত্তা, ব্যবহারবিদ্ Legal adviser) কোঠকরণ, বৈঠিকরণ, (accountant) দানাধ্যক্ষ, দলকরণ, পট্টনায়ক, সুমন্ত্র, মুদকরণ (যে চাবি রাখে) কৌড়াভাগিয়া (যে কড়ি ভাগ করে, কড়ি দ্বারা পূর্ব্বে কর গ্রহণ করিত) পড়িহারি (প্রতিহারী) উত্তরকপাট, পশ্চিমকপাট, দলই, দলবেহারা (সর্দ্দার), কোটোয়াল, বকৃসী, রাউতরা (সেনানায়ক) ইত্যাদি।

(৫) গুণবান ব্যক্তিদিগের উপাধি—গুণিরত্ন—(কালোস্নাতদিগের উপাধি); জ্যোতিষরত্ন, খড়িরত্ন (জ্যোতির্ব্বিদ্‌দের উপাধি); রণবিজলি—(চৌকীদারের উপাধি); সুবুদ্ধি—(বেহারা কি চাকরদের উপাধি)।

এখন এই সকল উপাধি কি রকমে লাভ করা যায়, তাহা কিঞ্চিৎ না বলিলে পাঠকগণের মনে আপসোস্ থাকিয়া যাইবে। অর্থাৎ কি কি করিলে বা কি কি হইলে ইহার কোন একটা উপাধি লাভ হইতে পারে। অবশ্য যিনি রাজা কিম্বা

রাজবংশোদ্ভব তাঁহার সে বিষয়ে কোন ভাবনার কারণ নাই। অন্য লোকে কি রকমে উপাধি পাইতে পারে, তাহাই বলিতেছি।

গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে উপাধি লাভ করিতে হইলে যাহা যাহা হওয়া কিম্বা যাহা যাহা করা আবশ্যক, এই উড়িষ্যার উপাধি লাভ করিবার প্রণালীও সেইরূপ। অতি সংক্ষেপে তাহা কিছু বলিতেছি। শ্রবণ করুন—

(ক) রাজাকে অনুসরণ করিলে।

এই অনুসরণ কথাটা উড়িয়া কথা; অথবা সংস্কৃত শব্দ, একটা কোন বিশেষ অর্থে উড়িয়া ভাষায় ব্যবহৃত হয়। সেই বিশেষ অর্থটি কোন একটি বাঙ্গলা প্রতিশব্দ দ্বারা প্রকাশ করা দুরূহ। সেইজন্য একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা এই অনুসরণ-প্রণালী বুঝাইতে হইল।

পঙ্কজসাহু মহাজনী কারবার দ্বারা দুই লক্ষ টাকার সম্পত্তি করিলেন; কিন্তু তিনি জাতিতে তেলী, সেজন্য সকলে তাঁহাকে যথোচিত মান্য করে না। এখন এই "সাহু" সংজ্ঞাটি কোন রকমে পরিত্যাগ করা, কিম্বা অন্য একটি আবরণে আবৃত করা ইহাই তাঁহার মনের একান্ত বাসনা। তিনি পুরীর মহারাজাকে অনুসরণ করিতে চলিলেন। রাজ-দরবারে যাইতে হইবে, সেইজন্য ভাল বেশভূষা পরিলেন—সে বেশ-ভূষা কি? না পরিধানে একখানি দক্ষিণী নীলছোপ দেওয়া

ধুতি; গায়ে তাহারই জোড়া একটি চাদর; কাঁধে একখানা গামছা; দুই কাণে দুইটি বড় বড় সোণার কুণ্ডল; গলায় এক ছড়া মালা, তাহার মধ্যে মধ্যে কয়েকটি সোণার ছোট ছোট মাদুলী; কোমরে এক ছড়া রূপার কিম্বা সোণার গোট। রাজাকে ভেট দেওয়ার জন্য কিছু কাঁচকলা, বেগুণ, কচু প্রভৃতি উপাদেয় জিনিষ লইয়া চলিলেন। রাজকর্ম্মচারিদিগকে যথোচিত-রূপে নজর দিলেন; অবশেষে রাজার সঙ্গে দেখা করিয়া তাঁহাকেও যথোচিত নজর দিলেন। সেখানে কয়েক দিন অবস্থিতি করিলেন। রাজ-দরবারে সর্ব্বদা যাতায়াত করেন, ও সর্ব্বদা যোড়হস্তে গরুড়পক্ষীর ন্যায় রাজসমীপে বসিয়া থাকেন, আর রাজা যখন যাহা বলেন, তাহাতেই সম্মতি প্রদান করেন। রাজা বলিলেন—"আজ বড় গরম পড়িয়াছে;" অমনি তিনি বলিলেন—"হাঁ, মনিমা(১)!" রাজা বলিলেন—"উঃ বড় শীত"; অমনি তিনি গায়ে কাপড় টানিয়া দিয়া বলিলেন—"খুব শীত"—ইত্যাদি। রাজা হাই তুলিলে তিনি হাতে তুড়ী মারেন; রাজা উঠিলে উঠিয়া দাঁড়ান; বসিলে তিনিও বসেন, রাজা বেড়াইতে বাহির হইলে, তিনি পশ্চাৎ পশ্চাৎ যোড়হস্তে গমন করেন। তাঁহার অসাক্ষাতে রাজকর্ম্মচারিগণ তাঁহার রজত-মুদ্রার প্রভাবে রাজার নিকট তাঁহার গুণ গান করে। এই রকম কিছু দিন পরে

(১) প্রভু, "My Lord".

তিনি একটি "হরিচন্দন" উপাধি লাভ করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। এই রকমে কাজ হাসিল হওয়ার পরে, কিন্তু রাজাকে দেখিলে হয়ত তিনি আর চিনিতেও পারিবেন না। ইহাকেই "অনুসরণ" বলে। এই রকমে অনুসরণ করিয়া উপাধি-লাভ আমাদের দেশেও কি নাই ?

(খ) রাজাকে টাকা দিলে।

যিনি টাকা দিয়া উপাধি নিতে পারেন তাঁহার অনুসরণ না করিলেও চলিতে পারে। ১৲ টাকা হইতে ১০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত —উপাধি গৃহীতার অবস্থা অনুসারে—রাজাকে প্রদান করা আবশ্যক। শুনা যায়, খালিকটের রাজা প্রায় ৩০।৪০ বৎসর পুর্ব্বে পুরীর মহারাজাকে ১১০০০৲ টাকা দান করিয়া মহারাজা উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। যিনি বেশী টাকা খরচ করিতে নারাজ, তাঁহাকে টাকা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটু অনুসরণ করাও আবশ্যক। তাহার অনুরূপ দৃষ্টান্তের আমাদের বঙ্গদেশেও অভাব নাই !

এই ধরুন একজন ক্ষুদ্র জমিদার একটি উপাধির জন্য লালায়িত হইয়াছেন; তাঁহার পক্ষে একটি "রায় বাহাদুর" হইলেই তিনি ধন্য হন। কিন্তু তিনি চারি পাঁচ হাজারের বেশী টাকা দিতে পারেন না; কাজেই তাঁহাকে কিছু অনুসরণ করা আবশ্যক। তিনি এক দিন কালেক্টর সাহেবের সঙ্গে দেখা

করিতে গেলেন। সাহেব তাঁহার মনোগত ভাব জানিতেন। সাহেবের সঙ্গে তাঁহার এইরূপ কথাবার্ত্তা হইল—

সাহেব। আমার এ জেলার শাসন-প্রণালী সম্বন্ধে আপনার মত কি ?

জমি। হুজুর ! ধর্ম্মাবতার ! আপনার সুশাসনে এ জেলার আবালবৃদ্ধবণিতা সকলেই সুখী !

সাহেব। তবে কাগজে আমাকে গালাগালি দেয় কেন ?

জমি। হুজুর ! সেই মিথ্যাবাদীদের কথা শুনিবেন না—let the dogs bark.

সাহেব। এবার ফসলের অবস্থা কেমন ?

জমি। ধর্ম্মাবতার ! আমাদের শাস্ত্রে আছে রাজার পুণ্যফলে ইন্দ্রদেব বর্ষণ করিয়া থাকেন। হুজুরের গুণে খুব ভাল ফসল হইবে আশা করা যায়।

সাহেব। কিন্তু আমি সংবাদ পাইয়াছি, কোন কোন থানায় জল-অভাবে ফসল মারা গেল।

জমি। হুজুর ! সেখানকার প্রজাগুলা নিতান্ত পাপাত্মা, অধার্ম্মিক, তাহার সংশয় নাই।

সাহেব। আপনি জানেন এ জেলার পর্দ্দানশীন স্ত্রীলোক-দিগের চিকিৎসার জন্ত আমি একটি হাঁসপাতাল স্থাপন করিতে ইচ্ছা করিয়াছি ?

জমি। হুজুর! সে অতি উত্তম সংকল্প; তাহা হইলে হুজুরের নাম চিরস্থায়ী হইবে, আর এ দেশের স্ত্রীলোকদিগের বিশেষ উপকার হইবে। আহা! কত স্ত্রীলোক বিনা চিকিৎসায় মারা গেল!

সাহেব। এ দেশে পর্দ্দানশীন স্ত্রীলোকদিগের কোন চিকিৎসা হয় না কি? পুরুষ ডাক্তার কিম্বা কবিরাজ তাঁহাদিগকে চিকিৎসা করিতে পারেন না?

জমি। হুজুর! তাহা হইলে আর এ দেশের এত অধঃপতন হইবে কেন?

সাহেব। কিন্তু আসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন বাবু আমাকে বলিয়াছেন, তিনি অনেক মহিলার চিকিৎসা করিয়াছেন গ্রামেও নাকি কবিরাজেরা চিকিৎসা করেন?

জমি। (থতমত খাইয়া)—হাঁ, তা—হবে।

সাহেব। তবে উক্ত হাঁসপাতালের প্রয়োজন কি?

জমি। (মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে) তাইত? তবে হুজুরের একটি কীর্ত্তি বজায় রহিবে।

সাহেব। আমারও সেই মত, আমি একটা হাঁসপাতাল স্থাপন করিব।

জমি। ধর্ম্মাবতার! আমিও সে বিষয়ে হুজুরের কিঞ্চিৎ সাহায্য করিব। আমি সেইজন্য পাঁচ হাজার টাকা দিতে পারি

সাহেব। আপনাকে ধন্যবাদ।

এস্থলে অনুসরণ ও অর্থদান উভয় প্রকার উপায় অবলম্বন করা হইল। উড়িষ্যার রাজদরবারেও এই রকম হইয়া থাকে। তবে উড়িষ্যার রাজারা গবর্ণমেণ্ট অপেক্ষা অনেক উদার (liberal); কেন না উপাধি-গৃহীতার অবস্থানুসারে তাঁহারা ১৲ টাকা নিয়াও উপাধি দান করেন। কিন্তু কোন কালেক্টর সাহেবের নিকট যদি কেহ ১৲ টাকা দক্ষিণা লইয়া উপাধি প্রদানের প্রস্তাব করে, তবে সে অবিলম্বে পাগলা-গারদে প্রেরিত হইবে। আর উড়িষ্যার রাজারা উপাধির মূল্যটা নিজেরা গ্রহণ করেন, সেজন্য তাঁহাদিগকে ইংরাজরাজপুরুষ অপেক্ষা more businesslike বলিয়া বোধ হয়।

(গ) গুণবান্ হইলে।

গুণবান্ ব্যক্তিদিগকে, রাজা টাকা না নিয়াও উপাধি দিয়া থাকেন। শুদ্ধ আচরণ, ভদ্রতা, সুবুদ্ধি এ সকল দেখিয়াও উপাধি দেওয়া হয়। তবে কি না রাজার নিকট পরিচিত হওয়ার জন্য কিঞ্চিৎ অনুসরণ করা আবশ্যক। আমি একজন গানবাজনার ওস্তাদকে জানি; সে ব্যক্তি পুরীর রাজাকে ৫০০৲ টাকা নজর দিয়া "গুণিরত্ন" উপাধি লাভ করিয়াছে।

(ঘ) রাজার চাকরী করিলে।

রাজার চাকরী করিলেও রাজা উপাধি প্রদান করেন। ইহা এখানেও যেমন সেখানেও তেমন।

এইরূপে উপাধি লাভের বিবিধ উপায় বলিয়া দিলাম, এখন পাঠকগণ ইচ্ছা করিলে ইহার যে কোন উপায় অবলম্বন করিতে পারেন।

যাত্রাগান

প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ব্বে ৺সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার "বঙ্গদর্শনে" যাত্রাগানের সমালোচনা করিয়াছিলেন। এই ত্রিশ বৎসরের মধ্যে যাত্রাগানের কিরূপ উন্নতি বা অবনতি হইয়াছে তাহার খতিয়ান করিয়া দেখিলে মন্দ হয় না।

আমি যাত্রাগানের একজন ভক্ত। আমার মতে যাত্রা-গানের ন্যায় সর্ব্বজনপ্রিয় আমোদ আর নাই। কথকতার ন্যায় যাত্রাগান লোকশিক্ষার এক প্রধান উপায়। যাত্রাগানে এক-সঙ্গে চিত্তরঞ্জনী বৃত্তির অনুশীলন এবং ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষা হয়। একাধারে কাব্য ও সঙ্গীতকলার চর্চ্চার সহিত জ্ঞান লাভ হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় যাত্রাগানের এখন আর সে দিন নাই। সঞ্জীব বাবুর সমালোচনা পাঠে জানা যায়, তাঁহার সময়ে যাত্রা বলিতেই সাধারণতঃ বিদ্যাসুন্দরের পালা বুঝাইত, নচেৎ কালীয়-দমন কিম্বা রাম-বনবাস। তখন যাত্রাগান নিতান্ত crude (অপরি-ণত) অবস্থায় ছিল। সেই অতীতের সহিত তুলনায় এখন সঞ্জীব বাবুর সমালোচনার পর যাত্রাগানের দুইটি যুগ অতীত হইয়াছে। তাঁহার পরবর্ত্তী যুগকে পৌরাণিক যুগ বলা যায়। এই পৌরাণিক যুগেই যাত্রাগানের প্রকৃত উন্নতি হইয়াছিল।

এই সময়ে সুপ্রসিদ্ধ মতিরায়, ব্রজরায়, নীলকণ্ঠ প্রভৃতি যাত্রার অধিকারিগণ সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্ম ও নীতিশিক্ষার অক্ষয়-ভাণ্ডার রামায়ণ ও মহাভারত হইতে বাছিয়া বাছিয়া পালারচনা করিতেন। তাঁহাদের রচিত "ভীষ্মের শরশয্যা," "দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ," "অভিমন্যুবধ," "দক্ষযজ্ঞ," "সাবিত্রী-সত্যবান," "লক্ষ্মণের শক্তিশেল," "সীতার বনবাস," প্রভৃতি পালা এক-সময়ে বাঙ্গালীর চিত্ত মাতাইয়া তুলিয়াছিল। তাঁহাদের সময়েই যাত্রাগানের চরম উন্নতি হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয়, সেই সকল গুণবান্ ও রসজ্ঞ অধিকারিগণের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে যাত্রার ক্রমেই অবনতি হইতেছে। যাত্রাগানের বর্ত্তমান যে যুগ চলিতেছে, তাহাকে "নাটকীয় যুগ" বলা যাইতে পারে। এযুগে যাত্রা হইতেছে নাটকের ব্যর্থ অনুকরণ। এখন যাত্রা আর "গান" নাই, এখন যাত্রা হইতেছে "অভিনয়" বা "অপেরা," অথবা ষ্টেজবিহীন থিয়েটার। যেমন যাত্রা থিয়েটারে পরিণত হইতেছে, সেই-রূপ থিয়েটার আবার সার্কাসে পরিণত হইতেছে। কালে সার্কাস্‌ই সকলের আরাধ্য দেবতা হইবে, এরূপ লক্ষণ দেখা যাইতেছে।

কিছুকাল পূর্ব্বে আমি কলিকাতার কোন প্রসিদ্ধ থিয়েটার দেখিতে গিয়াছিলাম। গিয়া দেখিলাম হাতীর নাচ। তখন মনে

হয়, থিয়েটার দেখিতেছি না সার্কাস্ দেখিতেছি ? অবশ্য আমি যাহাকে হাতীর নাচ বলিতেছি, অনেক দর্শক তাহাকে দেবলিনার প্রতাপের সহিত গঙ্গা-গর্ভে সন্তরণ অথবা চৈতন্য-লীলায় নিত্যানন্দের হরিপ্রেমে নৃত্য মনে করিয়া করতালি দ্বারা রঙ্গভূমি মুখরিত করিয়াছিলেন। আমার কিন্তু সেই সন্তরণ ও নৃত্য দেখিয়া সার্কাসের কথা মনে পড়িয়াছিল। কিন্তু শুধু এ কারণে নহে, আধুনিক থিয়েটারকে আমি অন্য কারণে সার্কাস্ বলিতেছি। আধুনিক থিয়েটার ও যাত্রায় যে নাচ ঢুকিয়াছে, তাহাকে সার্কাসের জিম্ন্যাষ্টিক্ (Gymnastic) ভিন্ন আর কি বলিব ? আর থিয়েটার সার্কাসে পরিণত হওয়ার বাকী কি ?

সঞ্জীব বাবু পুরাতন যাত্রার নৃত্যসম্বন্ধে লিখিয়াছেন,—

"যে কোন সমাজেই হউক, নৃত্য বলিলে পদদ্বয়ের সঞ্চালন-গণিত দেহের মনোহর আন্দোলন বুঝায়, কিন্তু বঙ্গসমাজে কেবল দেহের * * * * যে ঘৃণিত আন্দোলন, তাহাকেই নৃত্য বলে।"

কিন্তু এখন আর সে দুঃখ নাই। এখনকার নৃত্য দেহের অঙ্গবিশেষের সঞ্চালন নহে, এখানকার নৃত্য কোন অঙ্গের সঞ্চালন না হইয়াও সাধিত হইতে পারে। এখানকার নৃত্য শুইয়া হয়, বসিয়া হয়, অর্দ্ধেক বসিয়া হয়, সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া হয়, আবার একজনের ঘাড়ের উপর আর একজন চড়িয়া হয়—

ঠিক যেন মহিষমর্দ্দিনী, সিংহ ও অসুরের উপর দণ্ডায়মান। এখনকার নৃত্যে সিস দেওয়া, বাঁশি বাজান, পাখীর ডাক ও আরও কত কিছুর অস্ফুট ধ্বনি শুনা যায়। সে কালের নৃত্য কেবল দেহের অঙ্গবিশেষের ঘৃণিত আন্দোলন ছিল, এখনকার নৃত্য বহুবিধ হাবভাব সহকারে যুগল-মিলন। শুনিতে পাই এই সকল হাবভাব দ্বারা নাকি সঙ্গীতের কবিত্ব ব্যাখ্যা করা হয়। কোন কোন স্থলে এইরূপ হাবভাব (posture) খুব সুন্দর দেখায় সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহার মধ্যে দূষণীয় ভাবও অনেক আছে। ইহাই নাকি সভ্যসমাজের সুরুচিসঙ্গত প্রকৃষ্ট রীতি সুতরাং এ সম্বন্ধে কাহারও কথা কহিবার অবসর নাই। সেই নৃত্যের যে তাল, তাহা আবার গাছ হইতে পাকাতাল পড়ার শব্দকে স্মরণ করাইয়া দেয়। অর্থাৎ কথা নাই বার্ত্তা নাই, একটি সুর হঠাৎ "থপ্" করিয়া থামিয়া পড়িল। যাহাদের কাণ সুর-গ্রামের ক্রমিক আরোহ ও বিলম্ব শুনিতে অভ্যস্ত, তাহাদের কাছে হঠাৎ এই থপ্ করিয়া থামিয়া যাওয়াটা যেন কেমন বর্ব্বরতা মনে হয়। কে যেন হঠাৎ একটি কলনাদী কোকিলকে গলা টিপিয়া মারিয়া ফেলিল, তাহার অর্দ্ধোচ্চারিত কলকূজন আকাশের মধ্যপথে থামিয়া গেল।

এই বিলাতী নাচের বিরুদ্ধ সমালোচনা করিতেছি বলিয়া কেহ মনে করিবেন না, আমি সেই পূর্ব্বতন খেমটা নাচকে

আবার আসরে আনিতে বলিতেছি। খেমটা নাচ খাঁটী স্বদেশী জিনিস নহে। সঞ্জীব বাবু বলেন উহা আধুনিক আমদানী জিনিস। তিনি যে পৌরাণিক মহারাষ্ট্রীয় নৃত্যের উল্লেখ করিয়াছেন, আমি উড়িষ্যাদেশে তাহা এখনও প্রচলিত দেখিয়াছি। আমার উড়িষ্যার চিত্র গ্রন্থে তাহার একটি চিত্র অঙ্কিত করিয়াছি। সে নৃত্যে কিছুমাত্র সুরুচিবিগর্হিত হাবভাব নাই, তাহা যেমন সুন্দর তেমন গম্ভীর। আমাদের যাত্রায় সেই নৃত্য প্রচলিত করিলে ভাল হয়।

সঞ্জীব বাবুর সময়ে যাত্রায় নৃত্যই প্রবল ছিল। তিনি লিখিয়াছেন—

"এক্ষণকার যাত্রায় নৃত্যই প্রবল, সকলেই নৃত্য করে। কি মেহতর কি ভিস্তী, কি মালিনী কি বিন্দা, সকলেই নৃত্য করে। কৃষ্ণ নৃত্য করেন, রাধা নৃত্য করেন, রাবণ নৃত্য করেন, সীতা নৃত্য করেন, কৈকেয়ী নৃত্য করেন,—বোধ হয় বৃদ্ধ রাজা দশরথও নৃত্য করিতেন কিন্তু তিনি প্রায় সকল যাত্রার দলে "বেহালাওয়ালা"। নৃত্য করিতে গেলে বেহালা বন্ধ হয়, নতুবা তাহার ত্রুটি ঘটিত না।"

আধুনিক যাত্রা এবিষয়ে অনেক সভ্য হইয়াছে সন্দেহ নাই, এখন এই নৃত্যরোগের তেমন বাড়াবাড়ি নাই। তবে এভাব যে বেশী দিন থাকিবে তাহারই বা ভরসা কি? যাত্রার

তোড়া

ওস্তাদ যে থিয়েটার তাহার মধ্যেও যখন সময়ে অসময়ে নৃত্যের বাহুল্য দেখা যাইতেছে, তখন যাত্রাও তাহার অনুকরণ না করিয়া ছাড়িবে কি? সঞ্জীব বাবু বৃদ্ধ রাজা দশরথকে নৃত্য করিতে দেখেন নাই কিন্তু আমি আধুনিক থিয়েটারে এক বৃদ্ধাকে তাহার পুত্রের সহিত একত্র নাচিতে দেখিয়াছি। আবুহোসেনের বৃদ্ধা জননার সহিত তাহার নৃত্য ও গানের স্বরে কথোপকথন সেই প্রাচীন যাত্রাকেও হার মানায়। অথচ সেই আবুহোসেনের এখনকার শিক্ষিত সমাজে কত আদর। আজকাল অনেক শ্রোতার মত এই—যদি নাচগান না শুনিলাম তবে থিয়েটারে গিয়া ফল কি? সেই সকল শ্রোতার মনোরঞ্জন করিতে গিয়া থিয়েটারের পালা লেখকগণও আজকাল নৃত্যের বাড়াবাড়ি করিতেছেন। এই শ্রেণীর নাটককার সাবিত্রী নাটকের মধ্যেও নাচ না ঢুকাইয়া পারেন নাই। সাবিত্রী নাটকেও যাঁহারা নাচ দেখিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগের সে নাটক না দেখাই ভাল।

নাচের সঙ্গে গানের কথাও আলোচ্য। কিন্তু নাচই বলুন আর গানই বলুন আমি এসব বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। আমার এসম্বন্ধে উপদেশ দিতে যাওয়া সম্পূর্ণ অনধিকার চর্চ্চা। তবে আমি যাহা বলিতেছি তাহা কেবল দর্শক বা শ্রোতার ভাবে বলিতেছি, সমজদারের ভাবে নহে। পূর্ব্বকালে যাত্রায় গানের

বড় দৌরাত্ম্য ছিল। কথায় কথায় গান, সময়ে অসময়ে গান, অভিনেতার গান, ছোক্‌রার গান, জুড়ীর গান। ইহাতে অভিনেতব্য বিষয়ের রসভঙ্গ হইত। শ্রোতাদিগের কাণ ঝালাপালা হইত। যাত্রার শেষ পর্য্যন্ত দেখা বা শুনা অসম্ভব হইয়া উঠিত। এই গানসম্বন্ধে সঞ্জীব বাবু একটি সুন্দর উদাহরণ দিয়াছেন,—

"শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণ সমভিব্যাহারে জানকীকে বনে পাঠাইলেন। জানকী পূর্ণগর্ভা, পদব্রজে কতকদূর গমন করিয়া বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন, বলিলেন—লক্ষ্মণ, আর যে আমি চলিতে পারি না।

লক্ষ্মণ। কি বলিলেন, মা জানকী, আর আপনি চলিতে পারেন না।

জানকী। না লক্ষ্মণ, আর আমি চলিতে পারি না। আমার সর্ব্বাঙ্গ অবশ হইয়াছে।

লক্ষ্মণ। সে কিরূপ? প্রকাশ করিয়া বলুন।

সে কিরূপ, তাহা ত জানকী প্রকাশ করিয়া বলিলেন, আবার কি অধিক প্রকাশ করিয়া বলিবেন?

প্রকাশ করিয়া বলার অর্থ গীত গাইয়া বলুন। অমনি গীত আরম্ভ হইল—"গর্ভবতী নারী, চলিতে না পারি, হইয়াছে অঙ্গ অবশ।" ইত্যাদি।

এখন নাটকের অনুকরণে যাত্রা হওয়াতে এই গীতের উৎপাত অনেক কমিয়াছে। এখন আর কথায় কথায় জুড়ী নামধারী চোগা-চাপকান-পরা পিরালী-পাগড়ী-মাথায় "মোক্তার লোক" (এক দলে দেখিয়াছি হাতকাটা গাউনপরা ভাকাল লোক) উঠিয়া দাঁড়ান না, এবং একজনের পর আর একজন ক্রমাগত রাগিণী ধরিয়া শ্রোতৃবৃন্দের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটান না। ছোকরার দলও এখন ঘন ঘন উঠিয়া সকলে সমস্বরে চীৎকার করিয়া কাণ ঝালাপালা করে না। কোন কোন দলে এমন সুন্দর নিয়ম দেখিয়াছি, একটি গায়ক একা দাঁড়াইয়া আগে গানটি গাইয়া যায়, পরে ছোক্‌রার দল কি জুড়ীরা উঠিয়া সেই গানটি গায়। ইহাতে গানটি কি তাহা বেশ বুঝা যায়। আর অধিকাংশ ভাল গানই এখন থিয়েটারের ন্যায় অভিনেতা নিজে গাইয়া থাকে।

কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? এখনকার গানের সুর তেমন মর্ম্মস্পর্শী হয় না। যাত্রার পৌরাণিক যুগে এক একটি ভাল গান শুনিয়া শ্রোতাদিগের অজস্র অশ্রুপাত হইত, অতি অল্প সময়ের মধ্যে সেই গান বঙ্গের পল্লীতে পল্লীতে প্রতিধ্বনিত হইত, ও ক্রমে তাহা সাহিত্যের স্থায়িসম্পদে (classics) পরিণত হইত। এখনকার গানে না আছে ভাব, না আছে মর্ম্মস্পর্শী সুর। অনেক গানের সুরই থিয়েটারের অনুকরণে

মিশ্রিত রাগিণীতে (জঙ্গলা) বাঁধা। বিশুদ্ধ ভৈরবী, পূরবী, খাম্বাজ, বেহাগ, বিভাস প্রভৃতি উচ্চ অঙ্গের সুর এখন যাত্রার আসর হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছে। যে সুরগাম্ভীর্য্যে অম্ভোধিনির্ঘোষ, মাধুর্য্যে পিককূজন, উচ্চতায় পাপীয়ার স্বরলহরী, কোমলতায় চাতকের ফটিকজল, লালিত্যে সলিলের কুলুকুলু ধ্বনি এখনকার যাত্রাগানে তাহা আর শুনা যায় না। যে সুর শ্রোতার হৃদয়ের অন্তস্তলে প্রবেশ করিয়া জন্মজন্মান্তরের সুখদুঃখের স্মৃতি জাগাইয়া দেয়, যাহা মর্ম্মে জড়িত হইয়া ভাবী সুখের সম্পদ সঞ্চয় করিয়া রাখে, এখনকার যাত্রায় সে সুর নাই। তাই এখনকার যাত্রার আসরে শ্রোতাদিগকে আর বড় কাঁদিতে দেখি না। সঞ্জীব বাবুও এ বিষয়ে আক্ষেপ করিয়া বলিয়াছেন,—

"বাঙ্গালায় আর বড় শোকের সুর নাই। কুচিহ্ন। শোকে সহৃদয়তা জন্মে। ঐক্য হয়। আন্তরিক শোক সকলের অদৃষ্টে ঘটে না, শোক পবিত্র; শোক স্বর্গীয়; শোক আবশ্যক।"

এখন অধিকাংশ সুরেই গাম্ভীর্য্য নাই, প্রায় অধিকাংশ সুরই হাল্‌কা। যেমন দৈনন্দিন জীবন-ব্যাপারে আমরা গাম্ভীর্য্য হারাইতেছি, সঙ্গীতেও তাই। জীবন আমাদের কেবল "স্ফূর্ত্তিতে" ভরা, উল্লাসে মাতোয়ারা, আমাদের আমোদ-প্রমোদও সেই-রূপ। কেহ হয় ত বলিবে, আমোদ করিতে গিয়া কাঁদিব কেন? কিন্তু যাঁহার কাঁদিবার উপযুক্ত হৃদয় আছে, তিনি

হাসিতে হাসিতে কাদেন আবার কাঁদিতে কাঁদিতে হাসেন। নিরবচ্ছিন্ন হাসি ও নিরবচ্ছিন্ন কান্না কোথায় আছে ?

নাচ ও গানের পর অভিনয়। বলা বাহুল্য অভিনয়ই আধুনিক যাত্রার প্রাণ। কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যাত্রা এখন "গান" নহে, অভিনয় অর্থাৎ নাটকের অনুসরণ। উৎকৃষ্ট যাত্রার দলে এখন অনেক ভাল অভিনেতা দেখা যায়। এ বিষয়ে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক উন্নতি হইয়াছে সন্দেহ নাই। আর অভিনেতাদিগের পোষাক-পরিচ্ছদের পূর্ব্বাপেক্ষা বিস্তর উন্নতি হইয়াছে। সঞ্জীব বাবুর সময়ে পরিচ্ছদের বড় দৈন্য ছিল। তিনি বলেন,—

"যাত্রার রাণী পরিচ্ছদে মেতরাণী।" ... "আর রাজার পরিচ্ছদ আরও চমৎকার ; ছিন্ন ইজার, মলিন চাপকান, আর তৈলাক্ত জরির টুপি। যে পরিচ্ছদে নকিব বা জমাদার সাজিয়া আসিয়াছিল, আবার সেই পরিচ্ছদে স্বয়ং রাজাও আসিলেন।"

এখনকার যাত্রায় রাজার পোষাকের পারিপাট্য অনেক খেতাবী মহারাজাকেও হারি মানায়। রাণী কিম্বা রাজকন্যার অঙ্গে বেনারসী শাড়ী শোভা পায়। এখনকার "নৃসিংহ দেব", কি "হনূমান" আর চাপকান পরেন না। তবে তাঁহারা গেঞ্জি না পরিয়া পারেন না। আবার পাড়া-কোঁদলী বালবিধবা "বিধি নাপতিনী"ও এই গেঞ্জির

য়া পরিত্যাগ করিতে পারেন না। এখন জুড়ীদিগের অঙ্গে ভাকালের" গাউন উঠিয়াছে। এখন বাকী কেবল জজের কলার"। তবে সেই গাউনপরা হাত যখন কল্কী ধরিয়া টান দেয় তখন শ্রীরাধিকার তামাক খাওয়ার মতনই বাভৎস দেখায়। হাল ফেসনের রাধিকার কিন্তু সে বালাই নাই। কারণ সিগারেট এখন খুব সস্তা এবং সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়।

অভিনয়ের প্রধান অঙ্গ হইতেছে কথাবার্ত্তা। কিন্তু সেই কথাবার্ত্তার জন্য অভিনেতার দোষ দেওয়া যায় না, যত দোষ পালাপ্রণেতা কবির। এই সকল কবিপুঙ্গবের বিরুদ্ধে আমার অনেক অভিযোগ আছে, ক্রমে তাহা বলিতেছি।

আমার মতে এই সকল পালা-লেখকই যাত্রাগানের পরম শত্রু। সম্প্রতি আমার কলিকাতার দুইটি প্রধান দলের গান শুনিবার সুযোগ হইয়াছিল, কিন্তু দুঃখের বিষয় একটি পালাও তেমনি জমিল না। সে সকল দলে ভাল অভিনেতার অভাব ছিল না, ভাল গায়কও যথেষ্ট ছিল, আবার উৎকৃষ্ট পোসাক-পরিচ্ছদ আসবাবও বিস্তর ছিল। গান জমিল না কেবল পালা-রচনার দোষে। এই সকল দলের সত্বাধিকারিগণ আমার মতে বৃথা অর্থব্যয় ও শক্তির অপচয় করিতেছেন। আর যাঁহারা এই সকল দল বায়না করেন তাঁহাদেরও দুর্ভাগ্য; সাত আট শত বা হাজার টাকা দিয়া সেই অর্থে অনেক সৎকাজ হইতে পারে।

যাত্রাগানের প্রধান উদ্দেশ্য যে লোকশিক্ষা (mass education) তাহা আর এখনকার যাত্রাগান দ্বারা সাধিত হয় না। বরং উল্টা উৎপত্তি হয়। এই সকল যাত্রাদ্বারা পল্লীর সর্ব্বসাধারণের রুচি দূষিত হয়। সহরবাসীদিগের রুচি ত থিয়েটারের সংস্পর্শে অনেক কালই দুষিত হইয়াছে। এই সকল যাত্রাগান দিয়া পল্লীর পবিত্রতা আর কলুষিত করা কেন?

মাইকেল মেঘনাদবধ কাব্যে লিখিয়াছেন—

"কি কুক্ষণে দেখেছিলি, তুই রে অভাগা
কাল পঞ্চবটী বনে, কালকূট ভরা
এ ভুজগে? কি কুক্ষণে, (তোর দুঃখে দুঃখী)
পাবকশিখারূপিণী জানকীরে আমি
আনিনু এ হৈম-গেহে?"

আমরাও সেইরূপ বলিতে পারি—

"কি কুক্ষণে, মাইকেল, রচেছিলে তুমি
মেঘনাদবধ কাব্যে, অমিত্র অক্ষরে;
কি কুক্ষণে, তোমা অনুকরি,
বরিলা গিরিশ ঘোষ
সেই ছন্দে
রঙ্গালয় মাঝে।"

স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র ঘোষ অমিত্রাক্ষর ছন্দে নাটক রচনা

করিয়া যশস্বী হইয়াছেন; সুতরাং নাটক রচনা করিতে হইলেই অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রয়োজন। আর যাত্রা যখন সুধু যাত্রা নামে সন্তুষ্ট না থাকিয়া নাটক হইতে বাঞ্ছা করেন, তখন যাত্রার পালাও অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত না হইলে তাহাকে লোকে নাটক বলিয়া মানিবে কেন? তাই যাত্রার রাজা, মন্ত্রী, সেনাপতি ইহারা সকলেই অমিত্রাক্ষর ছন্দে কথোপকথন করেন। ইহাদের মুখে কতকটা সে ছন্দ মানায়, কারণ ইহারা প্রায়ই বীররসের অভিনয় করেন। কিন্তু রাজা যখন অন্তঃপুরে প্রবেশ করেন, তখন রাণীর সঙ্গেও সেই অমিত্রাক্ষর ছন্দে কথোপকথন? হবে না কেন? বাঙ্গালীর বীরত্ব অনেক সময়ে অন্তঃপুরেই প্রকাশ পায়। রাজা, রাণী, রাজকন্যা, নারদঋষি ইহারা সকলেই অমিত্রাক্ষর ছন্দে কথোপকথন করুন ক্ষতি নাই। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই, যাহাদের শুনাইবার জন্য তাঁহাদের এই শ্রমস্বীকার, তাহাদের অধিকাংশ লোকেই এই কটমট বুলি বুঝিতে না পারিয়া হা করিয়া তাঁহাদের মুখের পানে তাকাইয়া থাকে। অমিত্রাক্ষর ছন্দের রচনা প্রায়ই দাঁতভাঙ্গা সংস্কৃতশব্দ-বহুল। বিদ্যালয়ের উচ্চশ্রেণীর ছাত্রদিগেরও সময় সময় তাহার অর্থ বুঝা কষ্টকর হয়। গ্রাম্য-শ্রোতা গোবিন্দ সরকার, মুকুন্দ সাহা, জগা তেলী, পরাণ নাপিত, মধো ধোপা, ক্ষেমী, বামী, রামীর ত কথাই নাই। এমন কি আমাদের মাসী পিসী মামী-

দিগেরও সে ভাষা বোধগম্য নহে। বাঙ্গালা-নভেল-পাঠনিরতা নব্য মহিলাগণ অবশ্য কতক কতক বুঝিতে পারেন। তাহা হইলে হইল কি? পৌরাণিক যুগের যাত্রাগান শুনিতে শুনিতে যে সকল স্ত্রী পুরুষের গণ্ডস্থল অশ্রুপ্লাবিত হইত, তাঁহারা এখনকার যাত্রাগানের কিছুমাত্র রস গ্রহণ করিতে পারেন না—তবে কাহাদের জন্য যাত্রাগান?

আধুনিক যাত্রার ভাষা যেমন দুর্ব্বোধ্য পালার প্লট ততোহধিক জটিল। অনেক পালা পৌরাণিক নামে প্রচলিত, কিন্তু তাহাদের মধ্যে পৌরাণিক আখ্যায়িকার অতি অল্প অংশই বিদ্যমান আছে। হুঁকার নলিচা ও খোল দুইই বদলাইয়া গিয়াছে। কারণ পালা-রচয়িতা মৌলিকতা দেখাইয়া কবি নাম সার্থক করিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু র'সো, দাদা, একটু থাম দেখি। কালিদাস ত একজন কবি ছিলেন? সেই কালিদাস স্বয়ং কবি যশঃপ্রার্থী হইয়া উপহাসকে কত ভয় করিয়াছিলেন, আর তুমি কি একেবারেই "নিরঙ্কুশ"? স্বয়ং বাল্মীকি, ব্যাস যে আখ্যায়িকা রচনা করিয়া গিয়াছেন তুমি কোন্ সাহসে তাহার উপর কলম ধরিতে যাও? মহাকবি কাশীরাম, কীর্ত্তিবাসও যতদূর সম্ভব সেই ঋষিদিগের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন।

পৌরাণিক পালা যদি বা কতক লোকে বুঝিতে পারে,

তথাকথিত ঐতিহাসিক ও মনগড়া পালার প্লট আরও দুর্বোধ্য। আর তাহার সবগুলিই প্রায় এক ছাঁচে ঢালা। এখানে একটা নমুনা দিতেছি। ছিলেন এক রাজা, ছিল তাহার এক সেনাপতি ও এক মন্ত্রী। রাজা থাকিলেই তাঁহার এক বা ততোহধিক রাণী থাকেন। সেনাপতির সহিত ছোট রাণীর জন্মিল প্রেম। সেনাপতি ইচ্ছা করিলেন রাজা হইতে। রাজা ছোট রাণীর বাধ্য—যেমন হইয়া থাকে। তিনি ছোট রাণীর ও সেনাপতির চক্রান্তে পড়িয়া মন্ত্রীর কথা না মানিয়া বড় রাণীকে পাঠাইলেন বনবাসে। বড় রাণীর এক শিশুপুত্র ছিল, সে প্রহ্লাদ বা ধ্রুবের ন্যায় হরিভক্ত। ব্যাধেরা তাহাকে ধরিয়া লইয়া কালীর কাছে বলি দিতে গেল। এদিকে সেনাপতি অন্য দেশের এক প্রবল পরাক্রান্ত রাজার সহিত ষড়যন্ত্র করিয়া রাজাকে রাজ্যভ্রষ্ট করিল। রাজাও কাঁদিতে কাঁদিতে বনে গেলেন। সেনাপতি ও ছোট রাণী রাজ্য অধিকার করিয়া বসিল। রাজার সেই হরিভক্ত শিশুকে স্বয়ং হরি আসিয়া উদ্ধার করিলেন। রাজা ও বড় রাণী ঘুরিতে ঘুরিতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজার খুব অনুতাপ হইল। মন্ত্রীর সহিত মিলিত হইয়া রাজা হরির কৃপায় আবার নিজরাজ্য উদ্ধার করিলেন। সেনাপতিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া হত্যা করা হইল। ছোট রাণী বিষ খাইয়া মরিলেন। বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি,

মন্ত্রীর একটি বয়স্থা অনূঢ়া কন্যা ছিল। সে হয় সেনাপতি না হয় আর কাহারও প্রেমে পড়িয়া চিরকুমারী থাকিল, নয় বিষ খাইয়া মরিল। এই যে সেনাপতিকে হত্যা করা হইল, তাহার কাটা-মুণ্ডটা আসরে আনিয়া সকলকে একবার দেখান হইল। কেবল মুণ্ড দেখাইয়াই নিস্তার নাই, সেনাপতি রাজা হইয়া যে সকল লোককে অন্যায় করিয়া বধ করিয়াছিল, তাহাদের কয়েকজনের প্রেতাত্মা আসিয়া সেই কাটামুণ্ডের রক্তপান করিতে লাগিল; হরিঠাকুর তাঁহার ভক্ত শিশুকে উদ্ধার করিবার সময় একবার মাত্র দেখা দিয়া থাকেন যদি তুমি মনে কর, তবে তুমি হরিকে চিনিতে পার নাই। হরি কি তেমন নিষ্ঠুর? তিনি কথায় কথায় যখন তখন শ্রীরাধিকাকে বামে লইয়া যুগল মূর্ত্তিতে দেখা দেন। এই আখ্যায়িকার মধ্যে হ্যাম্‌লেটের পিতার প্রেতাত্মা ও কিংলিয়ার নাটকের সেই পাগলকে যে বসান হইল না, সে কেবল আমার নিজের ত্রুটিবশতঃ, পালালেখকগণের সে বিষয়ে কোন ত্রুটি লক্ষিত হয় না।

যাত্রার পালার এই যে নমুনা দিলাম ইহাই যথেষ্ট। ইহাতেই পালারচকগণের কবিত্ব সুপরিস্ফুট। একটা "নূতন কিছু" না করিলে কবিকীর্ত্তি স্থায়ী হইবে কেন?

কিন্তু এদেশের নরনারী নূতন কিছু চায় না। তাহারা চায় পুরাণকাহিনী শুনিতে। পুরাণকাহিনী তাহাদের অস্থিমজ্জার

সহিত বিজড়িত। রাম লক্ষ্মণ, কৃষ্ণার্জ্জুন, যুধিষ্ঠির, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, অভিমন্যু, শুভদ্রা-দ্রৌপদী, সীতা-সাবিত্রীর লোক-পাবন কাহিনী সহস্র সহস্র বৎসরের পুরাতন হইলেও তাহা নিত্য নূতন। কারণ যাহা উচ্চতম আদর্শ, যাহা লোকে আয়ত্ত করিতে পারে না, তাহা চিরদিনই নূতন। হিমালয়ের উচ্চচূড়া দুরধিগম্য বলিয়া চিরদিনই তাহা অভিনব ভাবের (romance এর) রাজ্য থাকিবে। তুমি যাত্রাকর, যদি তুমি লোকশিক্ষার মহাব্রত গ্রহণ করিয়া থাক, তবে সেই সকল মজ্জাগত ভাবের স্ফুরণ করিতে পারিলেই তোমার উদ্দেশ্য সফল হইবে। তুমি নাটকের অনুকরণে মনগড়া কুৎসিত চিত্র দেখাইয়া সরলপ্রাণ পল্লীবাসীর চিত্ত কলুষিত করিও না। জগতে কবিত্বশক্তি বড়ই দুর্লভ বস্তু, নূতন আখ্যায়িকা গঠন ও নূতন চরিত্র-অঙ্কনের ক্ষমতা একমাত্র কবিরই আছে। পয়ারের চৌদ্দ অক্ষর মিল করিতে পারিলেই কেহ উত্তম পালা রচনা করিতে পারে না। উত্তম পালা রচনা করিতে হইলে কবিত্বশক্তির প্রয়োজন। যাত্রার অধিকারিগণ অনধিকারীর হাতে পালা-রচনার ভার দিয়া তাঁহাদের শক্তির অপচয় করিতেছেন, সঙ্গে সঙ্গে দেশেরও অপকার করিতেছেন। যতদিন পর্য্যন্ত উপযুক্ত লোকের দ্বারা পালা-রচনা সম্ভব না হয়, ততদিন সেই পৌরাণিক যুগের পালাই চলুক। এখনও দেশে সেই সকল ভক্তি ও করুণরসাত্মক পালার শ্রোতার অভাব হয়

নাই। এই সকল পালায় প্রকৃত মনুষ্যত্ব শিক্ষা দেয়। আমার মনে পড়ে একদিন "দণ্ডীপর্ব্বের" সুভদ্রা-চরিত্রের মহিমায় আমি এতদূর মুগ্ধ হইয়াছিলাম যে, স্নানাহার পরিত্যাগ করিয়া বেলা দুইটা পর্য্যন্ত সেই যাত্রাগান শুনিয়াছিলাম। কিন্তু এখন সে সব পালা আর বড় শুনি না। এখন আমাদের রুচির পরিবর্ত্তন হইয়াছে। আমাদের রুচির এই নাটকাভিমুখী গতি রোধ করা আবশ্যক হইয়াছে। আমাদের খাঁটী স্বদেশী জিনিষ এই যাত্রাগানকে অধোগতি হইতে রক্ষা করিবার আবশ্যক হইয়াছে। কারণ যাত্রাগান লোকশিক্ষার এক প্রধান উপায়। কলিকাতার প্রধান প্রধান দলের অধিকারিগণের নিকট আমার বিনীত নিবেদন, তাঁহারা যাত্রাগানকে এই অধোগতি হইতে উদ্ধার করুন।

বাঙ্গালা রমণীর গৃহস্থালী*

শ্রীযুক্ত তিনকড়ি চক্রবর্ত্তী কোন এক বড় সহরে বাস করেন। বাড়ীতে তাঁহার বৃদ্ধা মাতা রোগশয্যায় পড়িয়া আছেন। স্ত্রী শৈলবালা, তিনটি পুত্র ও দুইটি কন্যা লইয়া তাঁহার সংসার। আর একটি কন্যা সুরবালার বিবাহ হইয়াছে, সে সম্প্রতি শ্বশুরালয় হইতে পিতৃগৃহে আসিয়াছে। বড় পুত্র

* ভারতী-পত্রিকায় দিনাজপুরের সাহিত্য-সম্মিলনীর সভাপতি মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের অভিভাষণ বাহির হইয়াছে। চৌধুরী মহাশয় বিলাতফেরত হইলেও তিনি দুইটি খাঁটি স্বদেশী উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, যথা—"নিজের মা থাকিতে পরের গৃহিণীকে মা বলিও না। আর নিজের মাকে বিদেশী জামাজোড়া পরাইও না।" সেই সংখ্যার ভারতীতেই আর একজন বিলাতফেরত বাঙ্গালী ডাঃ ইন্দুমাধব মল্লিক "ইংলণ্ডে রমণীর গৃহস্থালী" নামে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহাতে দেখা যায় যে, তিনি বাঙ্গালী রমণীকে বিদেশী জামাজোড়া না পরাইয়া কিছুতেই ছাড়িবেন না। ডাঃ মল্লিক মধ্যে মধ্যে এক একটা অদ্ভুত আবিষ্কার দ্বারা সকলকে চমকাইয়া থাকেন। কিছু দিন পূর্ব্বে তিনি আবিষ্কার করিয়াছিলেন, বুদ্ধদেবের নির্ব্বাণ মুক্তিবাদ তাঁহার ভাত খাওয়ার ফল। তিনি এবার আবিষ্কার করিয়াছেন, "সে দেশের (বিলাতের) রমণীদের "এপ্রণ" পরা, বুকে ফুল গোঁজা, একটু কাল ফিতে পিন্ দিয়ে আঁটা, ছোট ছোট ফুল কাটা রুমাল,—ছোট ছোট হাতগুলি দিয়ে

রাখালের বয়স ১৮।১৯ বৎসর, সে স্থানীয় কলেজে পড়ে। তিনকড়ি বাবু কোন আফিসে কাজ করিয়া মাসে পঞ্চাশটি টাকা পান। ইহা দ্বারা তাঁহাকে সংসারের যাবতীয় খরচ নির্ব্বাহ করিতে হয়। কিন্তু গৃহিণী শৈলবালার-সুব্যবস্থার গুণে তাঁহাকে এতগুলি পুত্র-কন্যা লইয়াও কোন কষ্ট পাইতে হয় না। বাড়ীতে চাকর নাই, একটি ঝি আছে। সে বাড়ীর বাহিরের কূপ হইতে জল তুলিয়া আনে আর বাজার করে। এতদ্ভিন্ন গৃহের সমস্ত কার্য্য গৃহিণী শৈলবালাকে করিতে হয়।

পূর্ব্বাকাশে ঊষার কনকচ্ছটা ফুটিয়া উঠিবার পূর্ব্বেই শৈলবালা গাত্রোত্থান করেন। উঠিয়াই প্রথমে শাশুড়ীর ঘরে গিয়া তাঁহার খবর লন। বৃদ্ধা দীর্ঘকাল যাবৎ বাতরোগে উত্থানশক্তিরহিত, এমন কি বাহিরে গিয়া শৌচক্রিয়া করিতেও অক্ষম। শৈলবালা নিজ হস্তে তাঁহার মলমূত্রাদি পরিষ্কার করেন। তিন-

---

হাবভাব সহকারে তাহার পাদচারণ—ইহা দেখিলেই মনে হয় যে, সংসারে পরিচ্ছন্নতা, স্বচ্ছলতা, স্বাস্থ্য ও শান্তি জাজ্বল্যমান রহিয়াছে।" অতএব বাঙ্গালী রমণীকেও সংসারে পরিচ্ছন্নতা, স্বচ্ছলতা, স্বাস্থ্য, শান্তিলাভ করিতে হইলে "এপ্রণ" পরিয়া, বুকে ফুল গুঁজিয়া ইত্যাদি ইত্যাদি করা উচিত! কিন্তু এস্থলে বাঙ্গালা রমণীর যে চিত্র দেওয়া হইল, তাঁহারা কোন কালেও ডাঃ মল্লিকের ব্যবস্থা শুনিবেন না, কারণ "অঙ্গারঃ শতধৌতেন মলিনত্বং ন মুঞ্চতি"।

কড়ি বাবু প্রাতঃকালে উঠিয়াই কয়েক ছিলিম তামাক সেবন করেন, গৃহিণী তামাক সাজিয়া টিকায় আগুন ধরাইয়া রাখিয়া যান। দেখিতে দেখিতে পুত্রকন্যাগুলি জাগিয়া উঠে ও মুখ-হাত ধুইয়া পড়াশুনা আরম্ভ করে। যদি কেহ বেশীক্ষণ শুইয়া থাকে তাহাকে ডাকিয়া তোলা হয়।

বেলা ৭টার মধ্যে শৈলবালা স্নান করেন। স্নানান্তে স্বামীর আহ্নিকের জোগাড় করিয়া দেন। বাটীর ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণে কয়েকটি ফুল গাছ আছে, সুরবালা সেই গাছ হইতে ফুল তুলিয়া আনে। গৃহিণী পূজার আয়োজন করিয়া দিয়া ভাঁড়ার ঘরে যান এবং রন্ধনোপযোগী জিনিষপত্র গোছাইয়া লইয়া রন্ধন-শালায় প্রবেশ করেন। সেই রন্ধনগৃহ প্রত্যহ দুইবার পরিষ্কার করা হয়। উনানের ছাঁই বাহির করিয়া সেগুলি ঝাঁড়িয়া আধপোড়া কয়লাগুলি তুলিয়া লওয়া হয়। পরে ঘরের মেজে গোময় ও মাটী দিয়া পুছিয়া ফেলা হয়। সাধারণতঃ বাঙ্গালার রান্নাঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন (ডাঃ মল্লিকের মতে "ভীষণ!"), শৈলবালার চেষ্টায় তাঁহার রান্নাঘরে একটুও ময়লা জমিতে পারে না। রান্নাঘরের সংলগ্ন জলনির্গমের নালা তিনি স্নানের পূর্ব্বে নিজ হস্তে পরিষ্কার করেন। সেই ঘরের বাহিরে একটা হাঁড়িতে ফেন রাখা হয়, প্রতিবেশী গোকুলের মা তাহার গরুর জন্য সেই ফেন লইয়া যায়।

এবার উনান ধরান হইয়াছে। উনানে ডাইল চাপাইয়া দিয়া শৈলবালা তরকারী কুটিতেছেন। ঝি জল তুলিয়া আনিয়া একটা জালায় রাখিতেছে। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েগুলি এক একখানা রুটী গুড় দিয়া খাইয়া বই ও শ্লেট লইয়া বসিয়াছে। বড় ছেলে রাখাল বাহিরের ঘরে বসিয়া রঘুবংশ পড়িতেছে; বড় মেয়ে সুরবালা তাহার ঠাকুরমার কাছে একটা সেলাই হাতে করিয়া বসিয়াছে। গৃহিণী তাহাকে বিশেষ কোন কাজ করিতে দেন না, সে অনেক দিন পরে শ্বশুরঘর হইতে আসিয়াছে, এখন তাহার ছুটি। সে অধিকাংশ সময় তাহার ঠাকুরমার কাছে আসিয়া তাঁহার পরিচর্য্যা করে। শৈলবালা আলু কুটিতেছেন, তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া তুলসী নামক পাঁচ বৎসরের মেয়েটি শ্লেটে "কর", "খল" লিখিতেছে, আর হরি নামক সাত বছরের ছেলেটি অঙ্ক কসিতেছে। তিন বৎসরের একটি মেয়ে মিনি একখানা ছবির বই লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছে। তুলসী থাকিয়া থাকিয়া লেখা বন্ধ করিয়া মিনির সঙ্গে খেলা করিতেছে, কিন্তু মায়ের দৃষ্টি পড়িলে অমনি লেখায় মনোনিবেশ করিতেছে। পাঁচ মিনিটের বেশী সে মনঃসংযোগ করিতে পারে না। লিখিতে লিখিতে সে হঠাৎ উঠিয়া বলিল—"মা বাহ্যে যাব।" মা বলিলেন—"যা।"

মা তখন দেখিলেন, মিনি ছবির বই ছিঁড়িবার উপক্রম

করিতেছে। অমনি তিনি বইখানা কাড়িয়া লইলেন। মিনি রাগ করিয়া হতভম্ব হইয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। তুলসী পায়খানা হইতে আসিয়া বলিল—"মা, আমার পেটের অসুখ হয়েছে।"

মা বলিলেন—"তবে যা অষুধ খেয়ে আয়।"

তিনকড়িবাবু বাড়ীতে একটা হোমিওপ্যাথিক ঔষধের বাক্স রাখেন এবং আবশ্যকমত ছেলেপুলেদিগকে বই দেখিয়া ঔষধ দেন। তিনি খবর পাইয়া আসিয়া বলিলেন,—

"তুলসী বলে, তার দাস্ত হয়েছে? এই প্রথম, না আরও দুই একবার হয়েছে?"

গৃহিণী বলিলেন, "এই প্রথম, কোন ভয় নাই। ওর কৃমি আছে, কৃমির অষুধ দাও।"

"কৃমি বুঝিলে কিসে? কৃমি দেখেছ?"

"না দেখি নাই,—কৃমি বই আর কি? পেটব্যথা পেট ব্যথা করে, রাত্রে নাক খোঁটে। ওরে ননী, তুই পড়া ছেড়ে উঠে এলি কেন?"

তিনকড়ি বাবু উঠিয়া আসিতে তাঁহার একাদশবর্ষ বয়স্ক মধ্যমপুত্রও তাঁহার সঙ্গে উঠিয়া আসিয়াছে। মায়ের প্রশ্নের উত্তরে সে বলিল,—"আমার পড়া হয়ে গেছে।"

মা বলিলেন, "কেমন করে হলো? কাল সন্ধ্যাবেলা

ঘুমিয়ে পড়েছিলি ; এর মধ্যে পড়া হয়ে গেল ? মিছ কথা।”

“না - মিছা কথা হবে কেন ? আমার পড়া ধর।”

তিনকড়ি বাবু বলিলেন,—“আচ্ছা ধরা যাবে এখন। তুই যা’ত, আমার ওষুধের বাক্‌সটা নিয়ে আয়। ছিনা দিয়া দেখি।’

“আমি যাচ্ছি” বলিয়া হরিও উঠিল। কিন্তু ননী “ছিন্—ছিন্—ছিনা” করিতে করিতে এক লম্ফে গিয়া ওষুধের বাক্স আনিয়া হাজির করিল। তিনকড়ি বাবু ওষধ বাহির করিয়া তুলসীকে খাইতে দিলেন।

ছোট শিশুটি তখন কান্না ধরিল, “আমি ওছুদ খাব” “আমি ওছুদ খাব।” মা বলিলেন “ও কথা বলে না দুষ্ট মেয়ে, তা হলে অসুখ হবে। তুলসী, এবার লিখ্‌তে বো’স্—ও কি রকম লিখেছিস—প-টা কেমন হয়েছে ?”

হরি হাসিয়া বলিল —“যেন ঘোড়ার মুখ !”

মা বলিলেন, “তুই বড় ফাজিল ! তোর কয়টা অঙ্ক হলো দেখি ?”

হরি বলিল,—“তিনটা, এই দেখ।”

ননী ইত্যবসরে প্রস্থান করিয়াছে। এই সময়ে দুধওয়ালী একটা ভাঁড়ে করিয়া দুধ লইয়া আসিল। শৈলবালা বলিলেন—“তুমি একটু ব’সো, আমি রান্না চড়াইয়া দিয়াছি, একবার দেখে

আসি আর কড়াটা নিয়া আসি। কালকার দুধটা এমন পাতলা ছিল কেন?"

দুধওয়ালী বসিয়া বলিল, "সে কি মা? আমার দুধ পাতলা হবে কেন? তোমরা ভদ্রলোক, কড়ি দিয়ে দুধ খাও, সে কি কখনও হ'তে পারে?"

গৃহিণী কড়া নিয়া আসিয়া বলিলেন "না,—কা'লকের দুধটা বড় পাতলা ছিল, মোটেই সর পড়িল না। আমার রাখাল ত পাতলা দুধ একেবারেই খেতে পারে না।"

দুধওয়ালী মাথায় হাত দিয়া বলিল, "মা, আমার মাথার দিব্যি লাগে, আমি একটুও জল মিশাই নাই। সে কি কথা, আমারও বেটা পুত্তুর আছে, তোমরা কড়ি দেবে টাকায় ৮ সের ভাও, যারা দশসের ন্যায় তাহাদের দুধে একটু আধটুকু জল মিশাই।" ইহা বলিয়া গোয়ালার মেয়ে কড়ায় দেড় সের দুধ মাপিয়া দিয়া প্রস্থান করিল।

রাখাল এই সময়ে একখানা নূতন বই হাতে করিয়া আসিয়া বলিল—"কই—সুরো কই—তার বই এসেছে।" ইহা শুনিয়া সুরবালা দৌড়িয়া আসিল এবং সকলে মিলিয়া সেই বই লইয়া কাড়াকাড়ি করিতে লাগিল। রাখাল চেঁচাইতে লাগিল, "আরে ছিঁড়ে যাবে, ছিঁড়ে যাবে। এক জনের হাতে থাকুক, আর সকলে দ্যাখ।"

"আমি ছবি দেখ্‌বো, ছবি দেখ্‌বো" বলিয়া হরি লাফাইতে লাগিল। রাখাল তখন সেই রামায়ণ বই খুলিয়া ছবি দেখাইতে লাগিল। মা বলিলেন—

"এখন এ বই রেখেদে। স্কুলের পড়া পড়। পরে বৈকালে আসিয়া দেখ্‌বি।"

এই সময়ে ঝি আসিয়া বলিল, "মা, বাজারে যাব, পয়সা দাও।"

শৈলবালা তখন আঁচল হইতে একটা সিকি খুলিয়া দিয়া বলিলেন, "মাছ তিন আনার আন্‌বে, আলু ঘরে আছে, পটল এক পয়সার, বেগুন এক পয়সার, নেবু এক পয়সার আর পান এক পয়সার আন্‌বে। শীঘ্‌গির করে এস, বেলা হয়ে গেছে।" ঝি প্রস্থান করিল।

বাজার করিয়া আসিতে আসিতে ডাল ও ভাত রান্না হইয়া গেল। মাছ আসিলে আলু দিয়া পৃথক্‌ স্থানে রান্না করা হইল। বেলা সাড়ে নয়টার মধ্যে রান্না শেষ হইল। ডাল ও ভাত রান্না হইলে শৈলবালা সর্ব্বাগ্রে শাশুড়ীকে খাইতে দিলেন। পরে মাছ রাঁধা হইলে ছেলে পুলেদের খাইতে দিলেন। তিনকড়ি বাবু বেলা ১০টার সময় স্নান করিয়া খাইতে আসিলেন। তিনি খাইতে বসিলে বড়মেয়ে সুরবালা কাছে বসিয়া পাখা করিতে লাগিল। বৃদ্ধা মাতা যতদিন সমর্থ ছিলেন ততদিন

তিনিই কাছে বসিয়া খাওয়াইতেন ও নানা কথা বলিতেন। এখন তিনি উঠিয়া আসিতে পারেন না, তবে শুইয়া শুইয়া কথা বলিতে ছাড়েন না। তিনি বলিলেন—

"বাবা, বৌমার কাপড় নাই, এবার ধোপার বাড়ী কাপড় দিতে পারিলেন না। দেখ পরণের কাপড় কেমন ময়লা হয়েছে।"

এই কথা শুনিয়া শৈলবালা বলিলেন, "না, কাপড় এখন থাক, টাকা কোথায়? আজ মাসের স'বে ১৩ দিন, এখনও ১৭ দিন বাকী। হাতে পুঁজি মাত্র ১০টি টাকা। আমার কাপড় আজ সাবান দিয়া কেঁচে নেবো এখন। মাসের এই কয়দিন পরে কাপড় কিনিলে চলিবে।"

তিনকড়ি বাবু বলিলেন, "মোটে দশ টাকা আছে?"

শৈলবালা বলিলেন "তবে কি? হিসাব ত রাখনা? ছেলেদের স্কুলের মাহিনা দিয়াছি যে?"

তিনকড়ি বাবু ডাল দিয়া ভাত মাখিয়া মুখে দিতে দিতে বলিলেন—

"তা'ত বুঝিলাম। তোমার কাপড় না হ'লেই বা চ'লবে কিরূপে? দোকান থেকে ধারে আনা যাবে এখন।"

শৈল। ধারে আনিয়া শোধ দিতে পারিলে'ত হয়? কাপড়ের দোকানে এখনও ১৫৲ টাকা বাকী আছে।

তিনকড়ি বাবু আর এক গ্রাস ভাত মুখে দিয়া বলিলেন, "কই, নেবু কই? ডালটায় একটু নুন বেশী হ'য়েছে।"

সুরবালা পাখা রাখিয়া নেবু আনিয়া দিল। গৃহিণী বলিলেন—

"নুন বুঝি ভুলে দুবার করে দিয়েছি। ডাল খাওয়া না গেলে মাছের ঝোল দিয়া খাও।"

গৃহিণীর বেশ ওস্তাদি আছে। তিন চু'চার পয়সার তরকারি, দুই তিন আনার মাছ আনিয়া তাহা গুছিয়া গাছিয়া তিন চারি রকমের ব্যঞ্জন রাঁধেন। তাহার হাতে কোন জিনিষেরই অপচয় হয় না। তিনকড়ি বাবুর ভোজন শেষ হইল। তিনি পান ও তামাক সেবন করিয়া আফিসে গমন করিলেন। তখন গৃহিণী আর একবার মোটামুটি স্নান করিয়া পূজা করিতে বসিলেন। প্রায় একঘণ্টা কাল পূজা করিয়া তিনি আহার করিলেন এবং আহারান্তে শয়ন করিয়া কিছুকাল বিশ্রাম করিলেন।

বেলা ৩টার সময় শৈলবালা উঠিয়া আবার গৃহকর্মে মনোনিবেশ করিলেন। ঘরের জিনিষপত্রগুলি যথাস্থানে সজ্জিত করিয়া রাখিয়া, শাশুড়ীর ঘরে বসিয়া ছোট শিশুটির জন্য একটা জামা সেলাই করিতে লাগিলেন। সুরবালা সেখানে বসিয়া তাহার ঠাকুরমাকে রামায়ণ পড়িয়া শুনাইতে লাগিল। সে

ইংরেজ-বালিকার মত বৈকাল বেলা পাড়ার কোন যুবকের হাত-ধরাধরি করিয়া খোসগল্প করিতে করিতে মাঠে বেড়াইতে না গিয়া বাড়ীতেই থাকে, ইহাতে হয়ত মন সংসারের পাপ-প্রলোভন হইতে দূরে থাকে।

বেলা চারিটা বাজিলে ছেলেমেয়েরা স্কুল হইতে আসিল। মা তাহাদের জলখাবার—মুড়া ও গুড় বাটীতে বাটীতে করিয়া সাজাইয়া রাখিয়াছিলেন। কোন কোন দিন রুটীও প্রস্তুত করিয়া রাখা হয়। কিন্তু বাজারের সন্দেশ রসগোল্লা নামধারী দ্রব্যবড়া এবাড়ীতে প্রবেশ করিতে পারে না। কখনও কখনও গৃহিণী সখ করিয়া মোহনভোগ কিম্বা অন্য রকম মিষ্টান্ন প্রস্তুত করিয়া থাকেন। কিন্তু অর্থাভাবপ্রযুক্ত তাহা প্রায়ই ঘটে না।

রাখাল জলখাবার খাইয়া বেড়াইতে গেল। আজ তাহাদের কলেজে ফুটবল ম্যাচ্ হইবে, সে একজন প্রধান খেলোয়াড়। ননীও তাহার সঙ্গে ম্যাচ দেখিতে গেল। হরি খাতা লইয়া লিখিতে বসিল। তুলসী মিনির সহিত খেলা করিতে লাগিল। তিনকড়ি বাবু পাঁচটার পরে আফিস হইতে ঘর্মাক্ত কলেবরে আসিলেন। সুরবালা রামায়ণ রাখিয়া তাঁহাকে পাখা করিতে লাগিল। তিনি শ্রান্তি দূর করিয়া মুখ-হাত ধুইলেন। গৃহিণী তাঁহার জলখাবার সরবৎ ও পেঁপে

আনিয়া দিলেন। তিনি তামাক সেবন করিয়া পান খাইতে খাইতে বেড়াইতে বাহির হইলেন।

গৃহিণী আবার তরকারী কুটিতে বসিলেন। পাড়ার গোকুলের মা তাহার গরুর জন্য ফেন লইতে আসিল। শৈল-বালা তাহাকে দেখিয়া বলিলেন "কই, তুমি আজ সকালে এলে না কেন?"

গোকুলের মা তাঁহার সম্মুখে পা ছড়াইয়া বসিয়া বলিল, "মা, আমি বড় মুস্কিলে পড়েছি। ছেলেটার আবার জ্বর হয়েছে। বাড়ীতে বৌ নাই, আজ সাতদিন বাপের বাড়ী গিয়াছে, তার কোন খোঁজ-খবর নাই।"

শৈলবালা ভাজার বেগুন কুটিতে কুটিতে বলিলেন, "তোমার ছেলের জন্য কাল সকালে আসিয়া ওযুধ নিয়া যাবে। উনি কত লোককে ওযুধ দেন। তোমার বৌ এমন কেন?"

"সে কথা আর ব'লো না মা। আমার বৌ কাহাকেও গ্রাহ্যি করে না।" ইহা বলিয়া রাগে গরগর করিতে করিতে গোকুলের মা ফেন লইয়া প্রস্থান করিল।

এই সময়ে 'বেল নেবে গো' বলিয়া একটি স্ত্রীলোক একটা ঝুড়িতে করিয়া বেল বিক্রয় করিতে আসিল। গৃহিণী ২টা পাকা বেলের দর ঠিক করিয়া তাহাকে একটা পয়সা দিলেন।

তাহাকে বলিলেন, "তুমি আর যখন যে ফল পাও আমাকে দিও। তোমার ছেলের নাম কি ?"

বেলওয়ালী পয়সাটা আঁচলে বাঁধিয়া বলিল, "মা আমার দুঃখের কথা কি বলিব, আমার ছেলে নাই। আজ সে বাঁচিয়া থাকিলে এককুড়ি বছরের যোয়ান হইত। সে থাকিলে আমার এত কষ্ট হবে কেন ?" ইহা বলিতে বলিতে তাহার চোখে জল আসিল। গৃহিণীও আঁচল দিয়া চক্ষু মুছিলেন। তাঁহার সর্ব্বজ্যেষ্ঠ পুত্রটি বাঁচিয়া থাকিলে সেও আজ কুড়ি বছরের হইত।

গৃহিণী তরকারী কোটা শেষ করিয়া ঘরের প্রদীপ জ্বালিয়া দিলেন এবং সন্ধ্যা সমাপন করিয়া রান্না চড়াইয়া দিলেন। ছেলে-মেয়েরা প্রদীপের কাছে বই লইয়া বসিল। তিনি মধ্যে মধ্যে আসিয়া তাহাদের খোঁজ লইতে লাগিলেন। ননীর হাতে একটা নূতন পেন্‌সিল দেখিয়া বলিলেন,—

"ওরে এটা কার পেন্‌সিল ? তোর পেন্‌সিল কোথায় ?"

গৃহিণী ছেলেদের একটা পেন্‌সিল কাটিয়া দুখানা করিয়া দেন। একখানা শেষ হইলে তবে আর অর্দ্ধেকখানা পায়।

তাঁহার প্রশ্নের উত্তরে ননী বলিল,—

"এ নরেশের পেন্‌সিল,—সে আমাকে দিয়াছে।"

"দিয়াছে ? তার পেন্‌সিল তোকে দিল কেন ? মিথ্যা কথা তুই চুরি করে এনেছিস্ ?"

"না—চুরি করিব কেন ?"

"তবে সে তোকে দেবে কেন ?"

"আমি যে সে দিন তাকে একটা জলছাপার ছবি দিয়েছিলাম ?"

মা বলিলেন 'খবরদার, কারও জিনিষ চুরি করিও না। আমি রাখালকে বলিব সে নরেশের কাছে জনিয়া আসিবে।"

ইহা শুনিয়া ননীর মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। তাহার চোখ দিয়া ফোঁটা ফোঁটা জল পড়িতে লাগিল। সে তাহার নিজের পেন্‌সিল হারাইয়া ফেলিয়া ভয়ে নরেশের পেন্‌সিল আনিয়াছিল। গৃহিণী আসল কথা বুঝিতে পারিয়া রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে রান্নাঘরে গেলেন, এবং তিনকড়ি বাবু বাড়ী আসিলে তাঁহাকে এ কথা বলিয়া দিলেন। তিনকড়ি বাবু ননীকে খুব ধমকাইলেন ও প্রহার করিলেন। সে কাঁদিতে কাঁদিতে শুইয়া পড়িল ও ক্রমে তাহার ঘুম আসিল।

এদিকে গৃহিণী রন্ধন শেষ করিয়া রাত্রি ৮টার সময় ছেলেমেয়েদের ভাত খাইতে দিলেন। ননী খাইতে আসিল না। তিনি তাহাকে অনেক কষ্টে তুলিলেন এবং কোলে বসাইয়া খাওয়াইতে লাগিলেন। ক্রমে তাহার মুখে হাসি দেখা দিল ও সে পেটভরিয়া ভাত খাইল।

তাহাদের খাওয়া হইলে তিনকড়ি বাবু আহার করিলেন।

গৃহিণী সকলকে খাওয়াইয়া সর্ব্বশেষে আহার করিলেন। শুইবার আগে তিনি ছেলে-মেয়েদের প্রত্যেকের গায়ে কাপড় আছে কি না ও ঘরের জানালা বন্ধ আছে কি না দেখিলেন। সে দিন সন্ধ্যার পরে বৃষ্টি হইয়াছিল, কাজেই ঠাণ্ডা পড়িয়াছিল। যে দিন মধ্য-রাত্রে বৃষ্টি হয় সে দিন তিনি উঠিয়া ছেলে মেয়েদের গা ঢাকিয়া দেন। সকল কাজ শেষ করিয়া শুইতে তাঁহার এগারটা বাজিল। সারাদিনের পরিশ্রমের পব অল্পকাল মধ্যেই তিনি সুষুপ্তির ক্রোড়ে নিমগ্ন হইলেন।

একটি মোকদ্দমার রায়

চল্‌তি ভাষা—বনাম—সাধুভাষা

এজলাস—শ্রীল শ্রীযুক্ত সার্ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর,

কে, টি ; এল্, টিটি, ডি ; সাহিত্য-সম্রাট্।

বাদী-পক্ষে—মিঃ পি চৌধুরী, বার-এট্-ল

তরফ সবুজপত্র, ভারতী এণ্ড্ কোং।

প্রতিবাদী-পক্ষে—মিঃ সি, আর, দাস, বার-এট্-ল

তরফ নারায়ণ, ঢাকারিভিউ এণ্ড্ কোং।

বাদী-পক্ষের নালিসের মর্ম্ম এই :—বাঙ্গালা-সাহিত্যে সাধু-ভাষা নামে যে একটি ভাষা বহু দিন হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহা প্রকৃত পক্ষে নিতান্তই অসাধু।

(১) তাহার জন্মটাই অস্বাভাবিকরূপে হইয়াছে, সুতরাং তাহাকে আইনের ভাষায় illegitimate বলা যায়।

(২) তাহার চাল-চলনও নিতান্ত অস্বাভাবিক অর্থাৎ কৃত্রিম। যাহা মানুষের জীবনে কখনও সত্য নহে, এই সাধু-ভাষায় তাহা সত্য বলিয়া চলিতেছে। "করিলাম," "খাইলাম," "চলিলাম," "করিতে পারিব না।" ইত্যাকার কথা কোনো

দেশের লোকেই জীবনে ব্যবহার করে না। সাধুভাষা অবাধে এই সব মেকি মুদ্রা চালাইতেছে।

(৩) যে সকল শব্দ খাঁটি সংস্কৃত, সেগুলির মধ্যে সামান্য পরিমাণে বাঙ্গলার খাদ মিশাইয়া এই সাধুভাষা বাজারে চালাইয়া আসিতেছিল। বিদেশী সাহেবদের এরূপভাবে প্রতারণা করা খুব সহজ ছিল, কিন্তু পরে তাহা ধরা পড়িয়াছে।

(৪) বাঙ্গালার বাস্তভিটাতে সংস্কৃত ব্যাকরণের খুঁট-গাড়ি করিয়া এই সাধুভাষা সীমানা অতিক্রম করার অপরাধ করিয়াছে।

(৫) বাঙ্গলার রাজধানীতে প্রচলিত স্বাভাবিক ভাষার বিরুদ্ধাচরণ করিয়া সাধুভাষা রাজদ্রোহের অপরাধ করিয়াছে।

(৬) বর্ত্তমান সাহিত্য-সম্রাট্ চল্‌তি ভাষার যে পথ তৈরি করিয়া দিয়াছেন, সাধুভাষা তাহার বিরুদ্ধ পথে চলিয়া অর্থাৎ বাদহাটা মিলাইয়া রাজদ্রোহের অপরাধ করিয়াছে।

(৭) সাধুভাষা এখন মৃতভাষার সামিল হইয়াও প্রতারণা-পূর্ব্বক নিজকে জীবিত ভাষা বলিয়া পরিচয় দিয়া বঙ্গদেশ দখল করিয়া বসিয়া আছে। এই সমস্ত কারণে সাধুভাষার দখল উচ্ছেদ করিয়া চল্‌তি ভাষাকে সাহিত্য-ক্ষেত্রের ডিক্রি দেওয়ার প্রার্থনা।

ইহার উত্তরে প্রতিবাদী-পক্ষের জবাব এই ঃ—১ম, সাধু-ভাষা ৬০ বৎসরের অধিক কাল বঙ্গ-সাহিত্য দখল করিয়া আছে, সুতরাং বাদীর দাবী তামাদি-দোষে বারিত।

২য়,—সাধুভাষাকে illegitimate বলা হইয়াছে, কিন্তু তাহার জন্মদাতা স্বয়ং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

৩য়,—"করিলাম," "খাইলাম," "চলিলাম" ইত্যাদি মেকি মুদ্রা নহে; এ সব পূর্ব্বতন রাজাদের ছাপ-মারা খাঁটি মুদ্রা, এবং বাদশাহী মোহরের মত এগুলি বঙ্গ, বেহার, উড়িষ্যা—এমন কি, সমস্ত ভারতবর্ষে অবাধে চলিতেছে। এই সব খাঁটি মুদ্রা ভাঙ্গিয়া স্থানভেদে "কল্লুম," "খেলুম," "চল্লুম" ইত্যাদি যে সব মুদ্রা চালাইবার চেষ্টা করা হইতেছে, এইগুলি মেকি। কারণ, ইহারা গোরক্ষপুরী "ঢেবুয়ার ন্যায়" সব জায়গায় চলে না, সুতরাং অচল।

৪র্থ,—বঙ্গভাষা উত্তরাধিকারসূত্রে তাহার পৈতৃক-আমলের সংস্কৃত শব্দরূপ খাঁটি সোণার যে সব অলঙ্কার পাইয়াছে, সেগুলি ত ফেলিয়া দিতে পারে না। সেই সব ভারি ওজনের অলঙ্কার কিছু কিছু ভাঙ্গিয়া চুরিয়া হাল-ফ্যাসন অনুসারে হাল্‌কা করিয়া লইয়া পরিতেছে। ইহাতে প্রতারণা হইল কিরূপে?

৫ম,—বাঙ্গলার বাস্তুভিটায় যদি "শব" পতিত থাকে, তবে সংস্কৃত বৈয়াকরণের দল অবশ্যই তাহাকে "দাহ" করিতে

আসিবে, এমন কি, বেড়া ভাঙ্গিয়াও আসিবে ; ইহাতে "মনোকষ্ট" করিলে চলিবে না। কারণ, ব্রাহ্মণের শবে ব্রাহ্মণেরই অধিকার। আর সেই বাস্তুভিটায় যদি "মড়া" কিংবা "লাস" পড়িয়া থাকে, তবে তুমি ইচ্ছা করিলে তাহা পোড়াইয়া ফেলিতে পার কিংবা মাটীতে কবর দিতে পার। সুতরাং সংস্কৃত বৈয়াকরণের দলের সীমানা অতিক্রমের অপরাধ হইতে পারে না।

৬ষ্ঠ,—বাঙ্গলার রাজধানী এখন কলিকাতায় আছে, আবার কখনও দার্জ্জিলিং যাইতেছে, কখনও বা ঢাকায়, চট্টগ্রামে যাইতেছে। অর্দ্ধেক বাঙ্গলার রাজধানী এক কলমের খোঁচায় পাকাপাকিভাবে একবার ঢাকাতে গিয়াছিল, আর এক কলমের খোঁচায় কলিকাতায় ফিরিয়া আসিল। আবার ভারতের রাজধানী ত এক কলমের খোঁচায় কলিকাতা ছাড়িয়া দিল্লীতে চলিয়া গেল। এরূপ অবস্থায় স্থায়ী সাহিত্যের ভাষা কিরূপে রাজধানীর সঙ্গে সঙ্গে চলিষ্ণু হইবে ?

৭ম,—সাধুভাষা এখনও মরে নাই ; কারণ, এখনও কথা কহিতেছে। সে বৎসর বৎসর বাঙ্গলা ভাষায় প্রকাশিত প্রায় সমস্ত পুস্তক, মাসিক পত্রিকা ও অন্যান্য সাময়িক পত্রিকার মধ্য দিয়া কথা কহে। যে কথা কহে, তাহাকে তীরস্থ করিতে পার, কিন্তু দাহ করা সঙ্গত নহে।

ইস্যু

বাদী ও প্রতিবাদী পক্ষের উক্তি বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক নিম্নলিখিত ইস্যু ধার্য্য করা হইল :—

(ক) বাদীর দাবী তামাদি-দোষে বারিত কি না ?

(খ) সাধুভাষা Illegitimate কি না ?

(গ) সাধুভাষা চোরামাল চালাইয়া ধরা পড়িয়াছে কি না ?

(ঘ) সাধুভাষা বাঙ্গলার বাস্তুভিটার মধ্যে খুঁটগাড়ি করিয়া অনধিকার-প্রবেশ করিয়াছে কি না ?

(ঙ) কলিকাতা রাজধানীর ভাষা সমগ্র বঙ্গ-সাহিত্যে চলিবে কি না ?

(চ) সাধুভাষা মরিয়াছে কি না ?

(ছ) যদি মরিয়া থাকে, তবে ত কোনই গোল নাই ; আর কোন ইস্যুর বিচার না করিলেও চলিবে। যদি না মরিয়া থাকে, তবে বাদীর দাবী ডিক্রি হওয়ার যোগ্য কি না ?

(জ) বাদী আর কি প্রতীকার পাইতে পারে ?

রায়।

এই সকল ইস্যুর বিচারের পূর্ব্বে আমার ব্যক্তিগতভাবে একটা কথা বলা আবশ্যক মনে করিতেছি। আমি জানিতে

পারিলাম, আমার অনুপস্থিতিকালে আমার কোনো কোনো অনুচর এই প্রকার মত প্রচার করিয়াছে :—

"বর্ত্তমান সাহিত্য-রথী যে-পথ তৈরি ক'রে দিচ্ছেন, সে পথে তোমার আমার মতো সামান্য কারবারিকে চল্‌তেই হবে।" (ভারতী—আষাঢ়, ১৩২৩)

অনেক সময় দেখা যায়, বাঁশের চেয়ে কঞ্চী দড়, আবার জমিদার ও রাজার পেয়াদা-বরকন্দাজদিগকে ধরিয়া আনিতে বলিলে তাহারা বাঁধিয়া আনে। বলা বাহুল্য, আমি আমার অনুচরদিগের এরূপ জুলুমবাজিতে নিতান্ত লজ্জিত হইয়াছি। আমি কখনও চল্‌তি ভাষার রাজপথ দিয়া কারবারীদিগকে মাল চালাইতে বাধ্য করিবার জন্য কাহাকেও পাহারাওয়ালা নিযুক্ত করি নাই। আমি স্বাধীন বাণিজ্যের বরাবরই পক্ষপাতী, এজন্য পশ্চিমদেশ হইতে নূতন নূতন ভাব আমদানি করিয়া আমি আমার অনেক রচনার শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিয়াছি। আবার এ দেশের বৈষ্ণব কবিদের অনেক ভাব আমার 'গীতাঞ্জলি'র মধ্য দিয়া পশ্চিমদেশে চালাইয়াছি। "আমি ছোট বেলা হইতে সাহিত্য-রচনায় লাগিয়াছি।" "যে ভাষা পুথিতে পড়িয়াছি, সেই সেই ভাষাতেই চিরদিন পুথি লিখিয়া হাত পাকাইয়াছি।" "ক্ষণিকায় আমি প্রথম ধারাবাহিকরূপে প্রাকৃত বাঙ্গালা ভাষা ও প্রাকৃত বাঙ্গালার ছন্দ

ব্যবহার করিয়াছিলাম। বলা বাহুল্য, ক্ষণিকায় আমি কোনো পাকা মত খাড়া করিয়া লিখি নাই, লেখার পরেও একটা মত যে দৃঢ় করিয়া চলিতেছি, তাহা বলিতে পারি না। আমার ভাষা রাজাসন এবং রাখালী, মথুরা এবং বৃন্দাবন কোনোটার উপরেই দাবি সম্পূর্ণ ছাড়ে নাই।” তাহার প্রমাণ, আমি মথুরার রাজাসনে বসিয়া এই যে রায় লিখিতেছি, ইহাতে সাধু-ভাষাই ব্যবহার করা উচিত মনে করি। আবার যখন আমি বৃন্দাবনে রাখালী করিতে গিয়া “ঘরে বাইরে” করিয়াছিলাম, অর্থাৎ যখন আমার মধুর বংশীরব শুনিয়া গোপললনাগণ ঘরের বাহিরে ছুটিয়া আসিত, তখন আমি প্রাকৃত ভাষারই আশ্রয় লইয়াছিলাম। এতদ্দ্বারা প্রমাণ হইল যে, সাধুভাষা এখনও মরে নাই, সুতরাং (চ) নম্বর ইস্যু প্রতিবাদীর পক্ষে নিষ্পত্তি করা হইল।

এখন বাদীর দাবী তামাদি হইয়াছে কি না, এই ইস্যুর বিচার করা যা’ক। রাজনীতি ও সাহিত্যক্ষেত্রে settled fact বলিয়া কিছু নাই। আর এ বিষয়ে একটা প্রবল নজিরও রহিয়াছে। বাংলা ভাষায় পয়ার-ছন্দ তিন চারি শত বৎসরেরও অধিককাল একাধিপত্য বিস্তার করিয়া আসিতেছিল। কিন্তু মাইকেল মধুসূদন দত্ত অবাধে সেই পয়ারকে বে-দখল করিয়া তাঁহার মেঘনাদবধ কাব্যে অন্য আর এক নূতন ছন্দ চালাইলেন।

এই নজিরের বলে, বাদীর দাবী তামাদিদোষে বারিত নহে। সুতরাং (ক) ইস্যু বাদীর পক্ষে নিষ্পত্তি করা হইল।

(খ) ও (গ) নম্বর ইস্যুর বিচার এক সঙ্গে করা যাই-তেছে। সাধুভাষার জন্ম কিরূপে হইল, তাহার আলোচনা করিলে দেখা যায়, "বাংলা গদ্য সাহিত্যের সূত্রপাত হইল বিদেশীর ফরমাসে, এবং তার সূত্রধার হইলেন সংস্কৃত পণ্ডিত, বাংলা ভাষার সঙ্গে যাদের ভাসুর-ভাদ্রবৌয়ের সম্বন্ধ। যদি স্বভাবের তাগিদে বাংলা গদ্য-সাহিত্যের সৃষ্টি হইত, তবে এমন গড়া-পেটা ভাষা দিয়া তাহার আরম্ভ হইত না। প্রাকৃত বাংলা বাড়িয়া উঠিতে উঠিতে প্রয়োজনমত সংস্কৃতের ভাণ্ডার হইতে আপন অভাব দূর করিয়া লইত। কিন্তু বাংলা গদ্য সাহিত্য তাহার ঠিক উল্টা পথে চলিল। গোড়ায় দেখি তাহা সংস্কৃত ভাষা, কেবল বাংলার নামে চালাইবার জন্য কিছু সামান্য পরিমাণে বাংলার শব্দ মিশাল করা হইয়াছে। এ এক রকম ঠকানো। বিদেশীর কাছে এ প্রতারণা সহজেই চলিয়াছিল," কিন্তু দেশী লোকের হাতে ইহা ক্রমে ধরা পড়িল। এই জুয়াচুরি প্রথমে ধরিলেন টেকচাঁদ, তিনি "আলালের ঘরের দুলাল" লিখিয়া ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিলেন। কিন্তু তখনও সেই ঠগের সর্দ্দার ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর জীবিত ছিলেন, কাজেই টেকচাঁদ বেশী দিন টিঁকিতে পারিলেন না। সেই বিখ্যাত ঠগের

ভয়ে, এমন কি, আমার পূর্ব্ববর্ত্তী সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কেও প্রথমতঃ এই প্রতারণাতে যোগদান করিতে হইয়াছিল। তিনিও বাংলা নাম দিয়া নিছক সংস্কৃত ভাষায় "দুর্গেশনন্দিনী," "কপালকুণ্ডলা" প্রভৃতি লিখিতে আরম্ভ করেন। পরে তিনি সেই সাধুভাষার সঙ্গ অনেকটা ত্যাগ করিয়া সৎপথে আসিয়াছিলেন। যাহারা ঋণদায়ে বিব্রত, তাহাদিগকেই অনেক সময়ে অসদুপায় অবলম্বন করিতে দেখা যায়। "অল্প মূলধনে ব্যবসা আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ মুনফার সঙ্গে সঙ্গে মূলধনকে বাড়াইয়া তোলা—ইহাই ব্যবসার স্বাভাবিক প্রণালী। কিন্তু বাংলা গদ্যের ব্যবসা মূলধন লইয়া সুরু হয় নাই, মস্ত একটা দেনা লইয়া তার সুরু।" সাধুভাষা সংস্কৃত ভাষার উত্তরাধিকারী, ইহার কোন Succession certificate দাখিল করা হয় নাই। অতএব সাধুভাষার সেই দেনাটা খোলসা করিয়া দিয়া স্বাধীনভাবে কারবার চালান কর্ত্তব্য। এইরূপে (খ) ও (গ) সংখ্যক ইস্যু বাদীর অনুকূলে মীমাংসা করা হইল।

এখন সেই অনধিকার-প্রবেশের কথা। বাংলার বাস্তুভিটার সীমানা লইয়া কিছুকাল হইল বিবাদ আরম্ভ হইয়াছে। জরিপ-জমাবন্দী ভিন্ন এই সীমানা নির্দ্দেশ করা কঠিন। পূর্ব্বে সে চেষ্টাও যে না হইয়াছে, এরূপ নহে। "সংস্কৃত বৈয়াকরণের উপর যখন জরিপ-জমাবন্দীর ভার পড়ে, তখন একেবারে

বাংলার বাস্তুভিটার মাঝখানটাতে সংস্কৃত ব্যাকরণের খুঁটগাড়ি হয়, আবার অপর পক্ষের উপর যখন ভার পড়ে, তখন তাঁরা বাংলার সংস্কৃত বিভাগে একেবারে দক্ষযজ্ঞ বাধাইয়া দেন। এখন আমাদের ভাষা-বিচ্ছেদের উপর সাঁড়া-ব্রিজ্ বাঁধা হইয়াছে। এখন আমরা মুখের কথাতেও নূতন পুরাতন সংস্কৃত শব্দ ব্যবহার করি, আবার পুঁথির ভাষাতেও এমন শব্দ চলিতেছে—পূর্ব্বে সাধুভাষায় যাদের জলচল ছিল না। আসল কথা, সংস্কৃত ভাষা যে অংশে বাংলা ভাষার সহায়, সে অংশে তাহাকে লইতে হইবে ; যে অংশে বোঝা সে অংশে তাহাকে ত্যাগ করিতে হইবে। কিন্তু যত দিন বাংলা বইয়ের ভাষা চলিত ভাষার ঠাট না গ্রহণ করিবে, তত দিন বাংলা ও সংস্কৃত ভাষার সত্য সীমানা পাকা হইতে পারিবে না।" অতএব (খ) সংখ্যক ইস্যুর চূড়ান্ত নিষ্পত্তি এখন না করিয়া, সীমানা নির্দ্দেশের জন্য উপযুক্ত কমিশন নিযুক্ত করিতে আদেশ দিলাম।

কিন্তু বাদী-পক্ষের সুবিজ্ঞ কৌন্‌সিল্ মিঃ চৌধুরী বলেন,— "বেচারা পুঁথির ভাষার প্রাণ কাঁদিতেছে, কথার ভাষার সঙ্গে মাল্য-বদল করিবার জন্য, কিন্তু গুরুজন ইহার প্রতিবাদী।" এই অভিযোগ যদি সত্য হয়, তবে আমি সেই গুরুজনদিগকে নিশ্চই জামিন-মুচলিকায় আবদ্ধ করিব। তাহা হইলে আবার

উভয় পক্ষের মধ্যে আপোষে মিলন হইয়া যাইবে, আর কমিশন নিযুক্ত করার প্রয়োজন হইবে না।

কলিকাতা রাজধানীর ভাষাই কি তবে বঙ্গ-সাহিত্যের ভাষা হইবে, এখন এই ইস্যুর বিচার করিতেছি।

"যারা প্রতিবাদী, তাঁরা এই বলিয়া তর্ক করেন যে, বাংলার চলিত ভাষা নানা জেলায় নানা ছাঁদের, তবে কি বিদ্রোহীদিগের দল (অর্থাৎ বাদীপক্ষ) একটা অরাজকতা ঘটাইবার চেষ্টায় আছে? ইহার উত্তর এই যে, যে যেমন খুসি আপন প্রাদেশিক ভাষায় পুঁথি লিখিবে, চলিত ভাষায় লিখিবার এমন অর্থ নয়।" যত সব মফঃস্বলবাসী লেখককে কলিকাতায় আসিয়া কিছুকাল বাস করিয়া কলিকাতার প্রাদেশিক ভাষা, মায় তাহার খাঁটি উচ্চারণ শিক্ষা করিতে হইবে—কারণ, আমার আদেশে উচ্চারণ অনুসারেই শব্দের বানান করিতে হইবে। এইজন্য আমি বাঙ্গলা হইতে "ঙ্গ"কে নির্ব্বাসিত করিয়া তাহার স্থানে 'অনুস্বর' অথবা ব্যাঙের ঠ্যাঙের "ঙ" বসাইয়াছি। তবে তাই বলিয়া "কলিকাতার যে একটা স্বকীয়া অপভাষা আছে, যাহাতে "গেনু," "করনু" ক্রিয়াপদ ব্যবহার হয় এবং "ভেয়ের বে," "চেলের দাম" প্রভৃতি অপভ্রংশ প্রচলিত আছে, সেই ভাষাও সাহিত্যে অচল।" কারণ, বৈষ্ণব কবিগণের মতে "স্বকীয়া" অপেক্ষা "পরকীয়ার" রস-মাধুর্য্য

সংপ্রতি বিশেষরূপে আস্বাদন করিয়াছেন, সেইজন্য তিনি বলেন, বৈষ্ণব-কবিগণের পরে আর বাংলায় গীতিকবিতা হয় নাই। যাহা হউক, এই স্বকীয়া ও পরকীয়ার সীমা কে সুনির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবে? তার উত্তর এক কথায় দিতেছি— প্রতিভাবান্ লেখক অর্থাৎ আমি। তবে এই "আমির" সামিল আমার দুই একটি অনুচরও প্রতিভাবান্ বলিয়া গণ্য হইবে। আর বাদীর কৌন্‌সিল্ মিঃ চৌধুরী, যিনি বহুকাল যাবৎ কি না লইয়া বাদীপক্ষ সমর্থন করিয়া আসিতেছেন, তাঁহার প্রতিভা থাক বা না থাক, তাঁহাকেও এই অধিকার দেওয়া হইল। কলিকাতার ভাষা বঙ্গসাহিত্যে কেন চলিবে, তাহার একটা স্বাভাবিক কারণও আছে। কলিকাতা বঙ্গদেশের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা নীচু জায়গা। "দিকে দিকে বর্ষণ হয়, কিন্তু জমির ঢাল অনুসারে একটা বিশেষ জায়গায় তার জলাশয় তৈরি হইয়া উঠে। এই স্বাভাবিক কারণেই কলিকাতা-অঞ্চলে একটা ভাষা জমিয়া উঠিয়াছে। তাহা বাংলার সকল দেশের ভাষা।" অর্থাৎ "তাহা বাংলার রাজধানীতে সকল দেশের মথিত একটা ভাষা।"

"আমাদের পাক-যন্ত্রে নানা খাদ্য আসিয়া রক্ত তৈরি হয়, তাহাকে বিশেষ করিয়া পাক-যন্ত্রের রক্ত বলিয়া নিন্দা করা চলে না, তাহা সমস্ত দেহের রক্ত। রাজধানী জিনিসটা স্বভাবতঃ দেশের পাকযন্ত্র। এইখানে নানাভাব, নানাবাণী এবং নানা

শক্তির পরিপাক ঘটিতে থাকে এবং এই উপায়ে সমস্ত দেশ প্রাণ পায় ও ঐক্য পায়।" বাংলার ভিন্ন ভিন্ন জিলার প্রাদেশিক ভাষাসমূহ কি প্রকারে কলিকাতায় আসিয়া মথিত হইয়া এই রাজকীয় চল্‌তিভাষার উৎপাদন করিতেছে, তাহা নিম্নে একটি চিত্র দিয়া বুঝান যাইতেছে।

প্রাদেশিক-ভাষাসমূহ।

"আমি কর্ত্তে পা'রবো না"	(নদীয়া)	কলিকাতা "আমি কোর্ত্তে পার্ব্বো না"
"আমি কর্ত্তি পারবো না"	(যশোর)	
"আমি কর্‌তে পার্‌মু না"	(ঢাকা)	
"আমি কর্ত্তাম্ পার্ত্তাম্ না"	(ময়মনসিং)	
"আমি হর্ত্তাম্ হার্ত্তাম্ ন"	(নোয়াখালী)	
"হামি কোর্ত্তে নাই পার্‌বো"	(মানভূম)	

সাধুভাষায় অবশ্য লেখা হয়—"আমি করিতে পারিব না। নদীয়ার ভাষা মৌখিক উচ্চারণে এই সাধুভাষা ভাঙ্গিয়া হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। অথবা গ্রিয়ারসন্ সাহেবের মতে পণ্ডিতপ্রধান নদীয়ার চল্‌তি ভাষা হইতেই সাধুভাষার উৎপত্তি। কিন্তু কলিকাতা নদীয়ার খুব নিকটবর্ত্তী হইলেও রাজধানীর চল্‌তি ভাষা নদীয়ার ভাষার ন্যায় সাধারণভাবে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া আমার মনে হয় না। ম্যাক্‌বেথ নাটকে বর্ণিত ডাইনীদিগের ঔষধ জ্বাল-দেওয়া কড়ার মত খুব প্রকাণ্ড কড়ায় (cauldron)

আনা-দেশীয় প্রাদেশিক ভাষা সুসিদ্ধ ও সুপক্ক হইয়া কলিকাতার "আমি কোর্ত্তে পার্ব্বো না" এই রাজকীয় চল্‌তি ভাষা নিষ্কাশিত হইয়াছে। কলিকাতার কুমারটুলি অঞ্চলে আমি এরূপ বড় বড় কড়া প্রত্যক্ষ করিয়াছি। বলা বাহুল্য, কলিকাতার এই "আমি কোর্ত্তে পার্ব্বোনা"কে রাসায়নিক যন্ত্রসাহায্যে বিশ্লেষণ করিলে ইহার মধ্যে নোয়াখালির সেই "আমি হত্তাম্ না" বীজ-ভাবে ধরা পড়ে। এই রাসায়নিক প্রক্রিয়াযোগে তৈরি রাজধানীর চল্‌তি ভাষা কালে ডিঃ গুপ্তের আরকের ন্যায় সমগ্র বঙ্গদেশে বোতলে বোতলে প্রচলিত হইলে বঙ্গসাহিত্যের ম্যালেরিয়াজনিত ক্ষীণতা ও দুর্ব্বলতা দূর হইয়া ইহার জীবনী-শক্তি বাড়িবে এবং ইহাকে সবল করিবে।

কিন্তু কলিকাতার এই চল্‌তি ভাষা চালাইবার জন্য এত ব্যস্ত হইলে চলিবে না। ইহা সময়সাপেক্ষ। "আমরা বাংলা-সাহিত্যে আজ যে ভাষা ব্যবহার করিতেছি, তার একটা বাঁধন পাকা হইয়া গেছে। অধিকাংশ লোকের পক্ষেই এই বাঁধনের প্রয়োজন আছে। নহিলে সাহিত্যে সংযম থাকে না। এ ক্ষেত্রে উচ্ছৃঙ্খল স্বেচ্ছাচারের আশঙ্কা যথেষ্ট আছে। মিঃ চৌধুরীর কথামত আজকের দিনে বাংলা দেশের সকল লেখকই যদি চল্‌তি ভাষায় সাহিত্য-রচনা সুরু করিয়া দেয়, তবে সর্ব্ব-প্রথমে তাঁহা-কেই কানে হাত দিয়া দেশছাড়া হইতে হইবে, এ কথা আমি

লিখিয়া দিতে পারি।” তাহার প্রমাণ ১৩২৩ সনের আষাঢ়ের “ভারতী”র “চল্‌তিভাষা” প্রবন্ধ। আর এক প্রমাণ, আমি দুই একটা শব্দ উচ্চারণানুসারে লিখিবার চেষ্টা করিতেছি দেখিয়া আমার অনুচরগণ বাংলা পুস্তকে “বারো আনায়, ভালো জিনিষ দ্যায়” এরূপ ঝুড়ি ঝুড়ি অশুদ্ধ কথা লিখিয়া পাঠশালার ছাত্রদিগের মনে বানানশিক্ষার প্রতি ঘোর অশ্রদ্ধা ও পণ্ডিতগণের মনে ক্রোধের সঞ্চার করিতেছে। আর “এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে, সাহিত্যে আমরা যে ভাষা ব্যবহার করি, ক্রমে ক্রমে তার একটা বিশিষ্টতা দাঁড়াইয়া যায়। তাহার প্রধান কারণ, সাহিত্যে আমাদিগকে সম্পূর্ণ করিয়া চিন্তা করিতে এবং সম্পূর্ণ করিয়া ব্যক্ত করিতে হয়, আমাদিগকে গভীর করিয়া অনুভব করিতে এবং তাহা সরস করিয়া প্রকাশ করিতে হয়; অর্থাৎ সাহিত্যের ক্ষেত্র নিত্যতার ক্ষেত্র। অতএব এই উদ্দেশ্যে ভাষাকে বাছিতে, সাজাইতে এবং বাজাইতে হয়।” আমরা যাহাকে সাধুভাষা বলিয়া নিন্দা করি, তাহাও এইরূপে অনেক বাছাই করিয়া, সাজাইয়া ও বাজাইয়া তৈরি করা হইয়াছে, এ কথা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। “এই জন্যই সাহিত্যের ভাষা মুখের ভাষার চেয়ে বিস্তীর্ণ ও বিশিষ্ট হইয়া পড়ে।” তবে আমার শেষ কথা এই—“প্রতিদিনের যে ভাষার খাদে আমাদের জীবন-স্রোত বহিতে থাকে,

সাহিত্য আপনার বিশিষ্টতার অভিমানে তাহা হইতে যতদূরে পড়ে, ততই তাহা কৃত্রিম হইয়া উঠে। চির-প্রবাহিত জীবন-ধারার সঙ্গে সাহিত্যের ঘনিষ্ঠতা রাখিতে হইলে তাহাকে এক দিকে সাধারণ আর এক দিকে বিশিষ্ট হইতে হইবে।” কিন্তু ইহাও আবার দেখা যায় যে, যদি কোন ব্যক্তি দুই নৌকায় পা রাখিয়া দাঁড়ায় আর তাহার একখানা নৌকা যদি স্রোতের বেগে চলিতে থাকে এবং আর একখানা নৌকা অচল হইয়া থাকে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির পক্ষে এক পা তুলিয়া নেওয়াই মঙ্গল। এই সকল পর্য্যালোচনা করিয়া আমি এই ইস্যু তরমিম্ (partial) ডিক্রি দিলাম। বঙ্গসাহিত্যক্ষেত্রে কলিকাতায় চল্‌তি ভাষার title (স্বত্ব) সাব্যস্ত হইল, কিন্তু possession (দখল) আপাততঃ সাধুভাষারই থাকিবে। সাধুভাষাকে চল্‌তি ভাষা eject (উচ্ছেদ) করিতে পারিবে না। উভয় পক্ষ নিজ নিজ খরচা বহন করিবে।* ইতি।

* সার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘ভাষার কথা” (সবুজ পত্র, চৈত্র ১৩২৩) অবলম্বনে লিখিত। নিম্নলিখিত প্রবন্ধগুলি দ্রষ্টব্য :—

(১) মিঃ পি, চৌধুরীর ১৩২২ সনের রাজসাহী সাহিত্য-সম্মিলনীর অভিভাষণ।

(২) ১৩২২ সনের আষাঢ় মাসের নারায়ণে প্রকাশিত “ভাষার কথা”।

(৩) ১৩২৩ সনের আষাঢ় মাসের ভারতীতে প্রকাশিত “চল্‌তি ভাষা”।

(৪) ঐ সনের ভাদ্র মাসের ঢাকা রিভিউয়ে প্রকাশিত “ঢাকায় রথযাত্রা”।

জজের মা

গদাধর বাবু সবজজ ছিলেন, সংপ্রতি করিমপুর জেলার জজ হইয়া আসিয়াছেন। তিনি আসিয়াই ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব, জয়েণ্ট-ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব ও পুলিশ সাহেবকে যথারীতি সেলাম দিয়া আসিয়াছেন। এই সাহেবেরাও তাঁহাকে রিটার্ণভিজিট্ (সেলামের প্রতিদান) দিবেন, তিনি এই আশায় নিজের বসিবার ঘরটা খুব ফিট্‌ফাট্ করিয়া সাজাইয়াছেন।

বসিবার ঘরটির মেজে সতরঞ্চ দিয়া ঢাকা। তাহার মধ্য স্থলে ছোট একখানা গোলটেবিল নীলরঙের বনাতে আবৃত। সেই টেবিলের উপর একটা ফুলদানিতে একটা ফুলের তোড়া, চুরুটদানিতে কয়েকটা মূল্যবান্ চুরুট, চুরুটের ছাই ঢালিবার জন্য একটা ছোট "এস্‌ট্রে", এবং একটা ম্যাচ্ বাক্স রহিয়াছে। জজসাহেব নিজে ধূমপান করেন না, কেবল আগন্তুক সাহেব-দিগের জন্য এইরূপ আয়োজন। এই টেবিলের চারিপাশে চারিখানি সুন্দর ঝকঝকে কৌচ। এতদ্ভিন্ন আরও কয়েক-খানা ইজিচেয়ার, সোফা, লিখিবার উপকরণ সহ একটা লম্বা টেবিল, একটা কাচের আলমারি, একটা টেবিল হার্ম্মোনিয়াম ইত্যাদি আসবাব দ্বারা ঘরটি সুসজ্জিত হইয়াছে। ঘরের

দেওয়ালে কতকগুলি মূল্যবান্ বিলাতী ছবি গৃহস্বামীর সুরুচির পরিচয় দিতেছে।

বেলা প্রায় নয়টা বাজিয়াছে। জজসাহেব চা খাইয়া আসিয়া প্রায় একঘণ্টাকাল এই ড্রইং রুমে বসিয়া আছেন। এই ড্রইং রুম ছাড়া তাঁহার আফিসঘর আর একটা আছে, সেখানে তিনি অধীনস্থ কর্ম্মচারিদিগের অর্থাৎ সবজজ, মুন্‌সেফ, ডেপুটী প্রভৃতির সহিত দেখা সাক্ষাৎ করেন এবং সেখানে বসিয়া রায় লেখেন।

জজসাহেব একখানা আরাম চৌকীতে বসিয়া "ষ্টেট্‌স্-ম্যান্" পড়িতেছিলেন। তাঁহার পরিধানে কোটপ্যাণ্ট্ এবং পায়ে স্লিপার। এই সময়ে হঠাৎ ড্রইং রুমের পরদার বাহির হইতে পাকাচুলওয়ালা একটা মাথা উঁকি মারিল। দেখিতে দেখিতে ধুতি-চাদর পরা খর্ব্বাকৃতি একজন বৃদ্ধ হাসিমুখে সেই ঘরে প্রবেশ করিয়া জজসাহেবের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিলেন,—

"কি গদাধর চিন্‌তে পার? আমি তোমার সহপাঠী ছিলাম—আমার নাম কালাচাঁদ মুখুর্জ্জে—এখন এখানকার স্কুলে মাষ্টারি করি।"

জজ সাহেব অমনি থতমত খাইয়া সোজা হইয়া বসিয়া বলিলেন,—

"কি—তুমি—এখানে কেন?—ঐ আফিস-ঘরে বসিয়া

কার্ড দিলেই ত হইত? আমি এখন ভারি ব্যস্ত আছি। কিছু মনে করো না—অন্য সময়ে দেখা হবে!"

কালাচাদ বাবু ইতিমধ্যে একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িয়াছিলেন। জজসাহেবের এই সাদর অভ্যর্থনায় উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন—"বটে, তাই নাকি! আমার নিতান্ত ঘাট হয়েছে, ভাই, মাপ কর। আমার আগেই বুঝা উচিত ছিল—তুমি এখন জেলার জজ, আর আমি একজন সামান্য স্কুল-মাষ্টার। কিন্তু পূর্ব্বের কথা একটু মনে করিয়া দেখিও—আগে কেমন গলাগলি ভাব ছিল। আমি তবে এখন আসি!"

এই বলিয়া তিনি পরদা উঠাইয়া সবেগে চলিয়া গেলেন। জজসাহেব ফ্যাল ফ্যাল্ করিয়া চাহিয়া রহিলেন। তিনি মনে মনে বলিলেন—"কি করি, আমার "পজিসন" রক্ষা করিতে হইলে এই রকম অনেক কথা শুনিতে হইবে।" তিনি চাপরাশীকে ডাকিয়া কেন বিনা-এত্তেলায় একজন বাজে লোককে ঘরে আসিতে দিল, এই অপরাধে তাহার এক টাকা জরিমানা করিলেন।

দেখিতে দেখিতে বেলা সাড়ে নয়টা বাজিল—একটু পরেই কাছারিতে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। কিন্তু সাহেবরা ত কেউ দেখা করিতে আসিলেন না? তবে কি তাঁহার এই বাসরসজ্জা আজও বৃথা যাইবে?

এই সময়ে চাপরাশী হেদাতুল্লা একখানা কার্ড আনিয়া তাঁহার হাতে দিল। সে কার্ডে স্বয়ং ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের নাম। জজসাহেব অমনি ব্যস্ত-সমস্ত হইয়া উঠিয়া দাড়াইলেন এবং চাপরাশী কোনোকথা বলিবার আগে ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের কর-মর্দ্দন করিয়া ড্রইং-রুমে আনিবার জন্য তাড়াতাড়ি বাহির হইলেন।

কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব কোথায়? তিনি আফিস-কক্ষের বারান্দায় গিয়া দেখিলেন, ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেবের আর্দ্দালী দাড়াইয়া আছে, তাঁহাকে দেখিয়া সে লম্বা সেলাম করিল। তিনি আর্দ্দালীকে বলিলেন, "ম্যাজিষ্ট্রেট্ সাহেব কোথায়?"

আর্দ্দালী বলিল—"হুজুর, সাহেব এই কার্ড দিতে বলিয়া পুলিস সাহেবের সঙ্গে শীকার করিতে গেলেন। হুজুরের সঙ্গে এখানে মোলাকাত করিতে আসিবেন না—কেবল এই কার্ড দিতে বলিলেন।"

ইহা বলিয়া আর্দ্দালী মুচকী হাসিয়া লম্বা সেলাম করিয়া প্রস্থান করিল। জজসাহেব নিতান্ত ম্লানমুখে আবার সেই ড্রইং-রুমে আসিয়া বসিলেন।

কিন্তু মানুষের "পজিসন" যত বড়ই হউক, তাহার দুঃখের অন্ত নাই। হেদাতুল্লা এই সময়ে ডাকের চিঠি আনিয়া জজ-সাহেবের হাতে দিল। তাহার একখানা চিঠি পড়িয়া জজ-সাহেবের একেবারে চক্ষু স্থির!

তাঁহার বৃদ্ধা জননী দেশে থাকেন। তিনি অনেক দিন রোগশয্যায় পড়িয়া আছেন ; এবার নিজের অন্তিমকাল আসন্ন জানিয়া তাঁহাকে বাড়ী যাইতে লিখিয়াছেন। তিনি পত্রশেষে লিখিয়াছেন—"বাবা—তোমার চাঁদমুখখানি দেখিয়া মরিতে চাই, ইহা ছাড়া আমার জীবনের আর কোন সাধ নাই।"

গদাধর জজ হওয়ার পূর্ব্বে বরাবর তাঁহার মাতাকে সঙ্গে সঙ্গে রাখিতেন। তিনি মাতার প্রতি বাস্তবিকই স্নেহশীল ছিলেন। কিন্তু জজ হওয়ার পরে তাঁহাকে সাহেবী কায়দায় থাকিতে হইবে বলিয়া মাতাকে পল্লীগ্রামের বাড়ীতে রাখিয়াছিলেন। বৃদ্ধা মাতাও—হঠাৎ সাহেব পুত্রের সংসর্গে ধর্ম্ম-নাশের আশঙ্কায় দেশে থাকিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু দেশে ম্যালেরিয়া জ্বরের প্রাদুর্ভাব হওয়াতে, তিনি আজ ছয়-মাস কাল পীড়িতা হইয়াছেন। পূজার দীর্ঘাবকাশে জজসাহেব সস্ত্রীক দার্জ্জিলিং গিয়াছিলেন, সুতরাং সেখানে মাতাকে সঙ্গে করিয়া নিতে পারেন নাই। অন্য কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে পাঠাইয়া দেওয়াও ব্যয়সাধ্য বটে, এবং সঙ্গে কে নিয়া যাইবে। এই সব কারণে মাতার চিকিৎসা ও শুশ্রূষার কোনই সুবিধা হয় নাই। এখন তাঁহার আসন্নমৃত্যুর সংবাদে জজসাহেবের মনে আত্মগ্লানি উপস্থিত হইল। কিন্তু তিনি এই বলিয়া মনকে প্রবোধ দিলেন—মা বুড়া হইয়াছেন, তিনি কিছুতেই

বেশী দিন বাঁচিবেন না; তিনি শেষ বয়সে জজের মা হইয়া মরিলেন, ইহাতেই তাঁহার সন্তুষ্ট থাকা উচিত।

যাহা হউক, মা তাঁহাকে দেশে যাইতে লিখিয়াছেন, তাহার সম্ভাবনা কোথায়? হাইকোর্ট তাঁহাকে ছুটী দিবেন কি? স্ত্রীর ব্যারাম বলিয়া টেলিগ্রাফ্ করিলে হাইকোর্টের সাহেবজজেরা তৎক্ষণাৎ ছুটী মঞ্জুর করেন। কিন্তু এ যে মায়ের ব্যারাম! তিনি এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে গৃহিণী অর্থাৎ হালি মেমসাহেবের সঙ্গে পরামর্শ করিতে উপরে গেলেন। গৃহিণী এখনও গাউন ধরেন নাই, তবে ছেলে মেয়েদিগকে সাহেবিকায়দা শিখাইতেছেন। তাহা না হইলে বাহিরের লোকের নিকট "পজিসন" রক্ষা হইবে কেন? চিঠির মর্ম্ম শুনিয়া গৃহিণী বলিলেন "তাই ত এখন কি করিয়া যাবে?" জজসাহেব নিতান্ত বিমর্ষচিত্তে বলিলেন "মা মরিলেন ত মরিলেন—তিনটা বছর আগে মরিলে আমার আর এই দুর্ভোগ ভুগিতে হইত না।"

গৃহিণী তাঁহাকে একটু তিরস্কার করিয়া বলিলেন "ছিঃ—ওকথা কি বল্‌তে আছে? অন্তিমকালে মা দেখিতে চাহিয়াছেন। তোমার এখন যাওয়াই কর্ত্তব্য।"

গৃহিণীর প্ররোচনায় অবশেষে জজসাহেব সাতদিন ছুটীর জন্য হাইকোর্টে টেলিগ্রাফ্ করিলেন। তাঁহার সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্যক্রমে ঠিক বলিতে পারি না, সেই দিনই ছুটী মঞ্জুর

হইয়া আসিল। বোধ হয় জজদিগের মধ্যেও কেহ মাতৃভক্ত ছিলেন। জজসাহেব পরদিন বাটী যাত্রা করিলেন।

বাটী পৌঁছিয়া দেখিলেন, তাঁহার মায়ের অবস্থা বড়ই শঙ্কটাপন্ন। গ্রামের কবিরাজ ভোলানাথ সেন তাঁহার চিকিৎসা করিতেছেন। তিনি বলিলেন "বাবু, আপনি আসিয়া খুব ভাল করিয়াছেন। একয়দিন কেবল দিনরাত্রি আপনার নাম করিয়াছেন। এখন সময় থাকিতে ইঁহাকে গঙ্গাতীরে নেওয়া উচিত।"

প্রথমতঃ বাবুসম্বোধনে জজসাহেবের মেজাজ একটু গরম হইল, কারণ তিনি এখন মিষ্টার হইয়াছেন, আর হ্যাট্-কোট্ পরিয়া আসিয়া তাঁহার গ্রামকে উন্নতি শিখরে আরূঢ় করিয়াছেন। দ্বিতীয় কথা এই, তীরস্থ করিতে হইলে পাল্কী করিয়া অনেক দূর লইয়া যাইতে হয়, সে বহুব্যয়সাধ্য ব্যাপার, আর সঙ্গে করিয়াই বা কে লইয়া যাইবে? তিনি কবিরাজকে বলিলেন— "মা সে সব হবে না। তুমি নাড়ী বুঝ না। আমি বেশ বুঝিতে পারিতেছি, শীঘ্র কিছু হবে না। আমি সঙ্গে যে কস্তুরি-ভৈরব আনিয়াছি, ইহাই খাইতে দাও।"

জজসাহেবের কথার উপর কথা কহিতে কবিরাজের সাহস হইল না। তিনি রোগীকে কস্তুরি-ভৈরব খাওয়াইতে লাগিলেন। কিন্তু খাওয়াইলে কি হয়? সেই দিন রাত্রি

একটার সময় জজের মা দেহত্যাগ করিলেন। মৃত্যুকালে পুত্রকে কোলের মধ্যে টানিয়া আনিয়া তাঁহার মাথায় হাত দিয়া কত আশীর্ব্বাদ করিলেন।

রাত্রি ভোর হইতে না হইতে প্রতিবেশিবর্গ আসিয়া মৃতার সৎকারের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। গদাধরের খুড়া হরিবাবু আসিয়া বলিলেন "বাবা গদাধর, আর বিলম্ব করা উচিত নয়। চল আমাদের সঙ্গে, তোমাকে মুখাগ্নি করিতে হইবে। ও পোষাক-টোসাক এখন খুলে ফেল। আহা, তোমার মা কি সৌভাগ্যবতী ছিলেন। তোমার ন্যায় উপযুক্ত পুত্র রাখিয়া গিয়াছেন। জজের মা হওয়া কয়জনের ভাগ্যে ঘটে ?"

গদাধর বলিলেন—"কাকা, চলুন আপনাদের সঙ্গে যাইতেছি। কিন্তু আমাকে মাপ করিবেন—এসব পোষাক খুলিতে পারিব না। তা'হলে যে আমার "পজিসন" রক্ষা হয় না। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব, পুলিস-সাহেব শুনিয়া কি বলিবেন ? তাঁহারা মনে করিবেন, বাঙ্গালীরা এসব উচ্চপদের অনুপযুক্ত। আমার দ্বারা অবশেষে বাঙ্গালীজাতির একটা মস্ত বদনাম হইবে। তা কখনও হইতে দিব না।"

হরিবাবু একটু হাসিয়া বলিলেন "বটে বটে, তাইত। তা'হইলে দেখিতেছি তুমি কাচাও পরিবে না—হবিষ্যিও করিবে

না। তুমি যে মায়ের একমাত্র সন্তান, শ্রাদ্ধটা তবে কে করিবে ?

"শ্রাদ্ধ আমিই করিব। আসল কাজে আমার কোন ত্রুটা হবে না কাকা, সেটা ঠিক জানিবেন।"

এই সময়ে কালীশঙ্কর বাচস্পতি উপস্থিত হইয়া বলিলেন—

"আপনার কল্যাণ হউক। শ্রাদ্ধটা অবশ্য দানসাগর হবে। এগার দিনে কি পেরে উঠ্‌বেন ?"

"দানসাগর—দানসাগর আবার কি ?"

হরিবাবু বলিলেন "শ্রাদ্ধ করিতে হইলে দান সাগর শ্রাদ্ধই তোমার করা কর্ত্তব্য। তোমার পিতা তালুকদারী করিয়া তাঁহার মায়ের দানসাগর শ্রাদ্ধ করিয়াছিলেন। আর তুমি হইতেছ একজন জেলার জজ ?"

বাচস্পতি বলিলেন—"জজের মার শ্রাদ্ধ ত দানসাগরই হওয়া কর্ত্তব্য।"

এবার গদাধর রুষ্ট হইয়া বলিলেন—"আমি বেশ জানি—ও সব আপনাদের ব্রাহ্মণদের টাকা নেওয়ার ফন্দী। যদি এই উপলক্ষে দানই করিতে হয়, তবে আমার মায়ের নামে একটা চতুষ্পাঠী স্থাপন করিব, কিম্বা একটা স্কুল স্থাপন করিব কিম্বা একটা ডাক্তারখানা করিব—যাহা চিরকালের জন্য তাঁহার স্মৃতি-রক্ষা করিবে।"

হরিবাবু বলিলেন—"আচ্ছা সে সব পরে হবে। তোমার যাহা অভিরুচি হয় তাহাই করিও। এখন ঘরে যে বাসি মড়া পড়িয়া রহিল, তাহার কি হইবে? তুমি যদি না যাও, তবে আমরাই শব লইয়া যাইতেছি।"

এবার গদাধরের মুখে হাসি দেখা দিল। তিনি বলিলেন —"কাকা, তবে আপনারাই যান। আমি এই সব জামা জুতা ছাড়িলে এখনই আমার অসুখ করিবে। আমি করিমপুরে ফিরিয়া যাওয়ার বন্দোবস্ত করিতেছি।"

হরিবাবু—"তবে শ্রাদ্ধের সময় আবার আসিবে। এই কয়টা দিন থেকে গেলেইত হইত?"

"না কাকা, আমার থাকিবার যো নাই। আমার ছুটী যে মাত্র সাত দিনের। শ্রাদ্ধের সময় আর ছুটী পাওয়া যাবে না। আমি যাহা কর্ত্তব্য, সেখানেই করিব। না হয় নৈহাটী গঙ্গাতীরে আসল কার্য্যটি সমাধা করিব। গঙ্গাতীর অতি পবিত্র স্থান, কি বলেন বাচস্পতি মশায়?"

বাচস্পতি মহাশয় ব্যঙ্গ করিয়া বলিলেন "অতি পবিত্র স্থান। সেখানে ব্রাহ্মণেরও কোন উপদ্রব নাই। কি বল হরিনাথ?"

হরিবাবু বলিলেন "ঠিক বলিয়াছেন। আচ্ছা তবে তোমরা কোমর বাঁধ। আর দেরী করার প্রয়োজন নাই।"

ইহা বলিয়া হরিবাবু অগ্রণী হইয়া প্রতিবেশীদিগের সহিত জজের মার শবস্কন্ধে করিয়া শ্মশানে লইয়া চলিলেন। জজসাহেবও কিছুক্ষণ পরে অন্যের স্কন্ধে চড়িয়া কর্ম্ম স্থলে যাত্রা করিলেন।

শবদাহ করিয়া ফিরিবার সময় গ্রামের বকাটে ছেলের গান করিতে করিতে আসিল—

ভাগের মা গঙ্গা পায় না।
জজের মার শ্রাদ্ধ হয় না॥

শ্রাদ্ধ যে একেবারে না হইল তাহা নহে। জজসাহেব এই কয়দিন নিরামিষ ভক্ষণ করিলেন, তবে সর্দ্দি লাগিবার ভয়ে তাঁহাকে ভোরে উঠিয়া খানসামার প্রস্তুত চা ও ডিম খাইতে হইত। একাদশদিনে তিনি এক দিনের ছুটী নিয়া চিরপবিত্র-স্থান নৈহাটীতে গিয়া মাতার আদ্যশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করিলেন। বৃষোৎসর্গাদি কিছুই হইল না। শ্রাদ্ধের মোট খরচ হইল যাওয়া আসার খরচসহ ১৭৸/১০। জজের মার ইহাতেই সন্তুষ্ট থাকা উচিত, কারণ তিনি জজের মা! আর দেশের লোক হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল—কবে তিনি মাতার স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ চতুষ্পাঠী, স্কুল-ডাক্তারখানা স্থাপন করিবেন। হরিনাথবাবু বলিলেন "তোমরা ব্যস্ত হইও না। গদাধর নিশ্চয়ই কোন একটা সৎকার্য্যে দশ হাজার টাকা দান করিয়া উইল করিবে।" আমরাও বলি তথাস্তু!

পাঁচু পুরোহিত

পঞ্চানন ভট্টাচার্য্য ওরফে পাঁচু ভট্‌চায্‌ পুরোহিতের ব্যবসা করেন। সেই জন্য তাঁহাকে লোকে পাঁচুপুরুতও বলিয়া ডাকে। বাল্যকালে তাঁহার বিদ্যা মুগ্ধবোধের কৃৎপ্রত্যয় পর্য্যন্ত খুঁটগাড়ি করিয়াছিল, পরে তাহা কৃষ্ণপক্ষের শশিকলার ন্যায় ক্রমশঃ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া এখন প্রায় অমাবস্যার ঘোর অন্ধকারে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু যদিও তিনি মন্ত্রপাঠ করিবার সময় "দুর্গায় নমঃ" "বিষ্ণবে নমঃ" বলিতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করেন না, দশকর্ম্মে তাঁহার পারদর্শিতা স্বীকার না করিয়া পারা যায় না। তবে নিজের পাওনাটা কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া লইতে তাঁহারই সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পারদর্শিতা দেখা যায়।

তাঁহার যজমানদিগের মধ্যে কুশলপুরের রাধিকাবাবু একজন সম্ভ্রান্ত গৃহস্থ। তিনি পৈত্রিক বিষয় সম্পত্তির আয়দ্বারা সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করেন। এক সময়ে তাঁহার অবস্থা খুব স্বচ্ছল ছিল, কিন্তু অপরিমিত ব্যয়ের জন্য তিনি ক্রমশঃ অনেক টাকার ঋণগ্রস্ত হইয়াছেন। একটি ছেলে সতীশ কলিকাতায় থাকিয়া বি, এ পড়িতেছে; তাহার খরচও এই বিষয়ের আয় হইতে চালাইতে হইতেছে।

আজ সাত দিন হইল রাধিকাবাবুর মাতৃবিয়োগ হইয়াছে। রাধিকাবাবু খুব মাতৃভক্ত। মাতা বৃদ্ধ বয়সে মরিলেও তিনি তাঁহার শোকে নিতান্ত আকুল হইয়াছেন। পাড়ার কয়েক জন ভদ্রলোক নিকটে বসিয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতেছেন। এই সময়ে পাঁচু পুরুত আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া পাড়ার প্রসন্নবাবু বলিলেন—

"কি পুরুত ঠাকুর ? আজ কি মনে করিয়া ?"

সদানন্দবাবু বলিলেন—"তা' বুঝি টের পান নাই ? এখন যে ওঁর মস্ত মরসুম পড়িয়াছে।"

ইহা শুনিয়া রাধিকাবাবু বলিলেন—"আজ তিন দিন থেকে উনি আনাগোনা করিতেছেন।"

পাঁচু হুঁকা হাতে লইয়া বলিলেন—"কর্ত্তা, আমার কি আর আহার নিদ্রা আছে ? আপনার যে শোক হইয়াছে, আমার তার চেয়ে এক তিল কম হয় নাই। আহা, বুড়া ঠাকুরাণী আমাকে মার মত ভাল বাসিতেন, তাঁর গুণের কথা আর কি বলিব ? হরিবোল—হরিবোল।"

ইহা বলিয়া পাঁচু ঠাকুর চাদরের এক কোণা দিয়া চক্ষু মুছিলেন এবং তামাক টানিতে লাগিলেন। পরে অন্যের হাতে হুঁকা দিয়া বলিলেন—

"কর্ত্তা, আমি একটা কথা বলিতে চাই। সেই জন্যই এই

তিন দিন আনাগোনা করিতেছি। লোকের মা একবার মরে, দুইবার মরে না। আপনার মা যেরূপ পুণ্যবতী ছিলেন, তাঁহার শ্রাদ্ধটা যেন সেইরূপই হয়। আপনি এ বিষয়টা খুব "পরিদেবনা" করিবেন।"

রাধিকাবাবু বলিলেন—"সে বিষয়ে আর আপনাকে বলিতে হইবে না। মায়ের শ্রাদ্ধে আমার সাধ্যের ত্রুটি হইবে না। তবে কি জানেন, অনেক গুলি টাকার দেনা হইয়াছি। আবার কন্যাদায়ও আছে।"

পাঁচু। সে সব জানি। তবে এখনকার দিনে লোকে কন্যাদায়কেই বড় দায় মনে করে। মা বাপের শ্রাদ্ধটা কোন রকমে সারিতে চায়।

প্রসন্নবাবু বলিলেন—"তার কারণ কি জানেন ত ? মা বাপের শ্রাদ্ধে খরচ করাটা ইচ্ছাধীন, কন্যার বিবাহের খরচটা ঘাড়ে ধরিয়া করায়। আর সকল প্রকার জিনিষের মূল্য বৃদ্ধি হইয়াছে, লোকের অবস্থায়ও কুলায় না।"

পাঁচু। কিন্তু যাঁদের ভাল অবস্থা আজ কাল তাঁরাও ত মা বাপের শ্রাদ্ধের বেলায় একেবারে ফাঁকি দেন।

সদানন্দবাবু বলিলেন—"রাধিকাবাবুকে আপনি কিরূপ শ্রাদ্ধ করিতে বলেন ভট্টচায্ মশায় ?"

পাঁচু। কর্ত্তার ইচ্ছা কর্ম্ম, আমি কি বলিব ? তবে দেশে

বাবুর যেরূপ খ্যাতি প্রতিপত্তি তাহাতে দানসাগর শ্রাদ্ধ না করিলে কিছুতেই চলিবে না।

এই সময়ে কেনারাম স্মৃতিতীর্থ আসিয়া বলিলেন—"ঠিক বলিয়াছ। দানসাগর শ্রাদ্ধ না করিলে মানাবে কেন?"

ইহা বলিয়া তিনি আসন গ্রহণ করিয়া রাধিকাবাবুর দিকে সতৃষ্ণ নয়নে দৃষ্টিপাত করিলেন।

রাধিকাবাবু বলিলেন—"দানসাগর—দানসাগর শ্রাদ্ধ ত মুখের কথা নয়—দানসাগর করিতে পারিব কেন?"

পাঁচু। কেন পারবেন না কর্ত্তা? আপনার প্রজা জগা কৈবর্ত্তদাস সে দিন তার বাপের দানসাগর শ্রাদ্ধ করিল, আর আপনি কিনা বলেন দানসাগর করিতে পারিবেন না?

প্রসন্নবাবু বলিলেন—"রেখে দিন আপনি জগাদাসের দানসাগর। ও রকম ছ্যাঁচড়া দানসাগর না করাই ভাল। কেবল ষোলটা ষোড়শ করিলেই দানসাগর হয় না—সে ত দিয়াছিল শিমূল কাঠের ষোল খানা খাট, বার আনা দামের শতরঞ্চ বিছানা, এই রকম সব জিনিষ—যার এক একটা ষোড়শের দাম পাঁচ টাকাও হবে না। এ রকম দানসাগর করার ফল কি?

স্মৃতিতীর্থ মহাশয় নাকে নস্য টানিয়া বলিলেন—"ফল আছে বৈ কি? শাস্ত্রে লেখে দানসাগর শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃ-

পুরুষের অক্ষয় স্বর্গ হয়। যাহাতে বাপ মা অনন্তকাল স্বর্গভোগ করেন, সন্তানের ত তাহাই কর্ত্তব্য। কি বল পাঁচু?"

পাঁচু। আজ্ঞে, যথার্থ কথা, খুড়া মহাশয়। তবে অবস্থা অনুসারে দান করিতে হইবে। জগা দাস যাহাই করুক, আজ কর্ত্তা দানসাগর করিলে, তিনি অবশ্যই শিমুল গাছের খাট দিবেন না। তিনি দানের দ্রব্যগুলি দেখিতে "সুশ্রাব্য" করিয়াই দিবেন। তবে অবশ্য ঘোড়া হাতী নৌকা পাল্কী এ সব তাঁহাকে দিতে বলি না। সে রকম অবস্থা এখন তাঁহার নাই। আর "বিলক্ষণা দান"—সে ত রাজারাজড়া ভিন্ন কেউ পারে না।

রাধিকাবাবু বলিলেন—"সে আবার কি?"

স্মৃতিতীর্থ এবার কাণ খাড়া করিয়া বলিলেন—"বিলক্ষণা দান হইতেছে—একটি বস্ত্রালঙ্কারভূষিতা ব্রাহ্মণ-কন্যাকে দান করা।"

সদানন্দ বাবু বলিলেন—"মানুষ দান কি রকম?"

প্রসন্নবাবু হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"সেটা বুঝলেন না? ব্রাহ্মণেরা পরের ঘাড় ভাঙ্গিয়া আপনাদের গৃহস্থালীর বন্দোবস্ত করিতে বসিয়া তাহার কোন অঙ্গই বাকী রাখেন নাই। মায় খাটবিছানা বাসন ভূমি ইত্যাদি ত নিবেনই, তার পরে আবার একটি সেবা দাসীও চাই।"

সদানন্দবাবু বলিলেন—"আমার বোধ হয় এই প্রথাটা

slave trade (দাসব্যবসায়ের)এর একটা relic (অবশেষ) এখনও সমাজে রহিয়াছে। ইহা উঠিয়া যাওয়াই মঙ্গল।”

স্মৃতিতীর্থ মহাশয় একটু রুষ্ট হইয়া বলিলেন—“আপনাদের ও সব ইংরেজী মত অনুসারে চলিলে ত আর শ্রাদ্ধ হবে না। হিন্দুর শ্রাদ্ধ, হিন্দুর শাস্ত্র অনুসারেই করিতে হইবে। কি বল পাঁচু?”

পাঁচু। আজ্ঞে—ঠিক বলিয়াছেন খুড়ামশায়। আপনি আসাতে আমার মস্ত জোর হইয়াছে। আমাদের যেরূপ অভিপ্রায় তাহা বলিলাম, এখন কর্ত্তার ইচ্ছা কর্ম্ম। বুড়া কর্ত্রী ঠাকুরাণী যেরূপ পুণ্যবতী ছিলেন, কর্ত্তা তাঁর উপযুক্ত পুত্র—তিনি কি আব তাঁর শ্রাদ্ধ ভাল রকম করিবেন না? আমাদের বলা অধিকন্তু।

স্মৃতিতীর্থ বলিলেন—“উপযুক্ত পুত্রের ত এই-ই কাজ। নচেৎ পিতা মাতা পুত্র কামনা করে কেন? আমাদের গ্রামের হরিশঙ্কর চক্রবর্ত্তী নিজের বিষয়-আশয় বন্ধক দিয়া টাকা কর্জ্জ করিয়া তবে মায়ের দানসাগর করিলেন। এইরূপ স্বার্থ ত্যাগ না করিলে কি পিতা মাতার ঋণ শোধ করা যায়?”

রাধিকাবাবু ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বলিলেন—“আপনারা আমার জন্য চিন্তিত হইবেন না। আমারও দেখিতেছি সেই পথের পথিক হইতে হইবে। আমি দানসাগর শ্রাদ্ধ করাই স্থির করিলাম।”

এই কথা শুনিয়া স্মৃতিতীর্থ ও পাঁচু সমস্বরে "সাধু রাধিকা-বাবু—সাধু রাধিকাবাবু" বলিয়া উঠিলেন। প্রসন্নবাবু ও সদা-নন্দবাবু একটু গা টেপাটিপি করিয়া উঠিয়া গেলেন। তখন রাধিকাবাবু পুরোহিত ঠাকুরের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া দানসাগর শ্রাদ্ধের ফর্দ্দ করিলেন।

(২)

শ্রাদ্ধের দিন রাধিকাবাবুর বাড়ীতে মস্ত ধূম। তাঁহার প্রতিবেশী আত্মীয় কুটুম্ব প্রভৃতি শত শত লোকে গৃহ পরিপূর্ণ হইয়াছে। দেশের ত্রিশ জন অধ্যাপক নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়া ছেন। তাঁহারা সভাস্থ হইয়া বিত্তার কচ্‌কচি অর্থাৎ শাস্ত্রের বিচার আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। বিস্তৃত প্রাঙ্গণের এক পার্শ্বে তাহাদিগের জন্য "সিধা" প্রস্তুত হইতেছে। কর্ত্তা রাধিকাবাবু চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইয়া কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন।

পাঁচু ঠাকুর কোমর বাঁধিয়া অর্থাৎ কোমরে একখানা নামাবলী জড়াইয়া দানের দ্রব্যাদি সাজাইতেছেন। স্মৃতিতীর্থ মহাশয় অধ্যাপক বিদায়ের অধ্যক্ষ হইয়াছেন। তিনি কর্ত্তাকে আসিয়া বলিলেন—"আমার একটা নিবেদন শুনুন। ঐ যে সিধা প্রস্তুত হইতেছে, উহা দানসাগরের উপযুক্ত নহে। দান-সাগর শ্রাদ্ধে এক একটি সিধায় চাউল দশ সেরের কম হওয়া উচিত নহে।"

অমনি পাঁচু আসিয়া বলিলেন—"আর ঘিও অন্ততঃ আধ সের দেওয়া উচিত।"

রাধিকাবাবু বিমর্ষচিত্তে বলিলেন—"আমার ত আয়োজন খুব বেশী নহে। আচ্ছা সেইরূপই দিতে বলুন।"

স্মৃতিতীর্থ বলিলেন—"আর একটা কথা। পাঁচু ভট্‌চায্‌ আপনার পুরোহিত—উনি একটা সিধা পাইতে পারেন।"

রাধিকাবাবু। তা' অবশ্য পাবেন।

পাঁচু এই সময়ে স্মৃতিতীর্থের কাণে কাণে কি বলিলেন। স্মৃতিতীর্থ বলিলেন—

"আজ্ঞে, একটা সিধা ত উনি পুরোহিত বলিয়া পাবেনই। উনি একজন পণ্ডিতও ত বটেন। সেইজন্য আর একটা সিধাও উঁহার প্রাপ্য।"

রাধিকাবাবু বলিলেন—"কৈ পণ্ডিত বলিয়া ত উঁহাকে আমরা জানি না।"

এবার পাঁচুর মুখ ফুটিল। তিনি বলিলেন—"কর্ত্তা, গাঁয়ের যোগী ভিখ্‌ পায় না যে কথাটা আছে তাহা ঠিক। আমার মুগ্ধবোধ পড়া আছে, আর বিদ্যারত্ন উপাধিও আছে। আপনি দেশ-বিদেশের এত পণ্ডিত নিমন্ত্রণ করিয়া আনিয়াছেন, তাঁদের সকলেই কি ন্যায়পঞ্চানন? এ কথাটা আপনি একবার "পরি-দেবনা" করিবেন।"

রাধিকাবাবু বলিলেন—"আচ্ছা, আচ্ছা সিধা আর একটা পাবেন। এখন আপনার কাজ দেখুন গিয়া।"

পাঁচু। এই যাচ্ছি। আর একটা কথা, কর্ত্তা। তিল দানের যে আধারটা আনা হয়েছে, সেটা নিতান্ত ছোট। খুব বড় একটা আধার দরকার। যত বেশী তিল দান করিবেন, তত বেশী দিন আপনার মাতা স্বর্গে বাস করিবেন। কি বলেন স্মৃতিতীর্থ খুড়া?

স্মৃতিতীর্থ। ঠিক কথা।

পাঁচু। কর্ত্তা, আপনার কর্ম্মচারীরা আপনার পয়সা বাঁচাইতে গিয়া এই রকম আসল কাজ অনেক খারাপ করিয়াছে। ঐ দেখুন জল-দানের এক একটা কলসী কি না এক একটা ঘটীর মত ছোট। যার নাম হইল দানসাগর শ্রাদ্ধ, তাহাতে দানের জিনিষ গুলি খুব "সুশ্রাব্য" হওয়া উচিত। কি বলেন স্মৃতিতীর্থ খুড়া?

স্মৃতিতীর্থ। ঠিক কথা।

পাঁচু। গুরুদেবের সুখাসনের জন্য যে খাটখানা দিয়াছেন সে অতি উত্তম হইয়াছে। কিন্তু ষোড়শের বেলায় হইল, ঐ পাঁচ টাকা দামের তক্তপোষ, এ সব আপনার "পরিদেবনা" করা উচিত ছিল। কেবল কর্ম্মচারীদের উপর এ সব কার্য্যের ভার দিলে চলে না। কারণ এই বৃহৎ ব্যাপারের যশ অপযশের ভাগী আপনিই হইবেন।

রাধিকাবাবু। সব কথা বুঝি ঠাকুর, সব কথা বুঝি। আমার সাধ্যে ত কুলায় না। এই জন্যই ত আমি দানসাগর করিতে এক প্রকার অনিচ্ছুক ছিলাম। কেবল আপনাদের পরামর্শে ইহাতে হস্তক্ষেপ করিয়াছি। এখন যেরূপ আয়োজন হইয়াছে, ইহা দ্বারাই কার্য্য-নির্ব্বাহ করুন।

এই সময়ে অধ্যাপকমণ্ডলীর মধ্য হইতে স্মৃতিতীর্থ মহাশয়ের তলব পড়িল। তিনি গিয়া দেখিলেন তাঁহাদের তর্ক বিচারের স্রোতে ভাঁটা পড়িয়াছে। প্রধান নৈয়ায়িক হরিরাম ন্যায়রত্ন বলিলেন—"ওহে স্মৃতিতীর্থ ভায়া, এবার আমাদের সিধা ও বিদায়ের চেষ্টা দেখ।"

স্মৃতিতীর্থ বলিলেন—আজ্ঞে সব প্রস্তুত। এই দেখুন আপনাদের নামের ফর্দ্দ করিয়াছি। কে কয় আনা বিদায় পাইবেন তাহা একবার ঠিক করিয়া বলুন, আমি লিখিয়া নিতেছি। আর বিদায়ের হারটাও কর্ত্তার নিকট শুনিয়া আসি।"

ন্যায়রত্ন। দাও, তবে ফর্দ্দটা আমার হাতে দাও।

স্মৃতিতীর্থ সে ফর্দ্দটা তাঁহার হাতে দিয়া, কর্ত্তার নিকটে গিয়া অধ্যাপক বিদায়ের হার কত হইবে তাহা জিজ্ঞাসা করিলেন। কর্ত্তা বলিলেন—

"আমার অবস্থা ত জানিতেছেন। বিদায়ের হার পাঁচ টাকা করুন।"

স্মৃতিতীর্থ যেন আকাশ হইতে পড়িয়া বলিলেন—"দান-সাগর শ্রাদ্ধে পাঁচ টাকা অধ্যাপক বিদায়? এ তো কখ্‌খনও শুনি নাই। অন্ততঃ দশ টাকা হওয়া উচিত।"

বাঘের সহচর ফেউয়ের মত পাঁচু ঠাকুর অমনি আসিয়া বলিলেন—"কর্ত্তা, বিদায়ের হারটা একটু "পরিদেবনা" করিবেন। ইহার নাম দানসাগর শ্রাদ্ধ। ইহার ফল অক্ষয় স্বর্গ। দেশে-বিদেশে পণ্ডিতগণ আপনার যশঃকীর্ত্তন করিবেন। কি বলেন, স্মৃতিতীর্থ খুড়া?

স্মৃতিতীর্থ। আমিও ত সেই কথা বলিতেছিলাম।

রাধিকা বাবু নিতান্ত বিমর্ষচিত্তে বলিলেন—"আচ্ছা, যখন না বুঝিয়া কার্য্যে হাত দিয়াছি, তখন যেরূপে হউক উদ্ধার করিতেই হইবে। দশ টাকা নয়, আট টাকা করিয়া বিদায়ের হার করুন।"

স্মৃতিতীর্থ। বেশ, বেশ,—অতি উত্তম পরামর্শ। আট টাকা হইলে, আমার হিসাব করিতেও কোন গোল হইবে না—সোজাসুজি হিসাব।

পাঁচু। হাঁ, ঠিক বলিয়াছেন। ষোলআনা বিদায় আট টাকা হইলে, স্মৃতির পণ্ডিত পাইবেন বার আনা অর্থাৎ ঠিক সোজাসুজি ছয় টাকা, আর ব্যাকরণের পণ্ডিত পাইবেন অর্দ্ধেক অর্থাৎ চারি টাকা—এতে আনা পাই ভাঙ্গিতে হইবে

না। আমার চারিটা টাকা আপনি রাখিয়া দিবেন খুড়া, দেখিবেন যেন ভুল হয় না। আমি এখন খুব ব্যস্ত আছি। কর্ত্তা, তবে একবার ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের অনুমতি নিয়া আসুন, দান কার্য্য আরম্ভ করা যা'ক। দানসাগরে যোলটা দান করিতে হইবে—অনেক সময় লাগিবে। কি বলেন, স্মৃতিতীর্থ খুড়া?

স্মৃতিতীর্থ। হাঁ, অনেক সময় লাগিবে। আবার ইহার ফলও তেমন অক্ষয় স্বর্গ। যে গাছটা বাড়িতে অনেক সময় লাগে, সেটা আবার থাকেও অনেক দিন জান ত? তুমি আর কাল-বিলম্ব করিও না। কর্ত্তা, তবে আসুন অধ্যাপক-দিগের অনুমতি গ্রহণ করিয়া কার্য্যারম্ভ করুন।

স্মৃতিতীর্থ এবং পাঁচু ভট্‌চায্‌ যাহাই বলুন, উপস্থিত অধ্যাপকগণ আট টাকা হারে বিদায় পাইয়া কর্ম্ম-কর্ত্তাকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন। আজ কালকার দিনে শ্রাদ্ধাদিতে ব্রাহ্মণ পণ্ডিত বিদায় প্রায়ই উঠিয়া গিয়াছে। সে জন্য চির-দুর্ভিক্ষগ্রস্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ নিতান্ত নিরুপায় হইয়া পড়িয়া-ছেন। এ জন্য যদি কখনও এক আধটা নিমন্ত্রণ জুটে, তাহাতে তাঁহারা অতি অল্পেই সন্তুষ্ট হইয়া দান গ্রহণ করেন। রাধিকা বাবুর নিকট এইরূপ বিদায় ও দশ সের চাউলের সিধা পাইয়া তাঁহারা প্রাণের সহিত তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে প্রস্থান করিলেন।

কিন্তু রাধিকা বাবুর পাঁচু পুরোহিতকে সন্তুষ্ট করা অতি কঠিন ব্যাপার হইয়া উঠিল। প্রথমেই ভোজ্য উৎসর্গের সময় পাঁচু বলিলেন, "কর্ত্তা দেখুন, আপনার কর্ম্মচারিদের কিছুমাত্র "পরিদেবনা" নাই। দানসাগর শ্রাদ্ধের ভোজ্য দিয়াছে, তাহাতে কি না পাঁচ সের চাউল, আর এক ছটাক ঘি!"

তাঁহার এইরূপ খুঁটিনাটিতে রাধিকাবাবুর শ্রাদ্ধ কার্য্যোচিত ধৈর্য্যাবলম্বন করা অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠিল। তিনি কোন কথার জবাব না দিয়া মন্ত্র পড়িতে লাগিলেন। দান শেষ করিতে বেলা প্রায় একটা বাজিল।

তখন বৃষোৎসর্গের আয়োজন কত দূর হইয়াছে তাহা দেখিবার জন্য পাঁচু "চৌরী"র নিকটে আসিলেন। বৈদিক পুরোহিত রামময় বিদ্যালঙ্কার চৌরীতে কলসী পিলশূজ প্রভৃতি সাজাইতে ছিলেন। সেখানে বিরাট ও গীতার পাঠকদ্বয়ও সঙ্কল্পের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। পাঁচু রামময়কে বলিলেন—"বিদ্যা-লঙ্কার খুড়া দানসাগর শ্রাদ্ধের কলসী সব কেমন দেখিতেছেন?"

বিদ্যালঙ্কার। কেন মন্দ কি?

পাঁচু। এ গুলি ত কলসী নয়, ঘট। ছিঃ ছিঃ—দান-সাগর শ্রাদ্ধের কলসী এরূপ হয়?

বিদ্যালঙ্কার। কিন্তু এত গুলি বড় বড় কলসী ত সংগ্রহ করাও কঠিন ব্যাপার।

পাঁচু। কঠিন কেন হবে? আমার ঘরে পাঁচ কুড়ি বড় কলসী মজুত আছে। আমি সেগুলি সস্তা দামে দিতে পারিতাম। কিন্তু আমার কথা কে শোনে? কর্ত্তার ইচ্ছা কর্ম্ম!

বিদ্যালঙ্কার। তোমার সেগুলি ত পুরাতন তৈজস। দানসাগর কার্য্যে নূতন তৈজস দেওয়াই ত উচিত। কি বলেন হরকান্ত দাদা?

গীতার পাঠক হরকান্ত সার্ব্বভৌম বলিলেন—"তা' ত বটেই। কৃতী তৈজসপত্র যাহা দিয়াছেন তাহা অতি উত্তম হইয়াছে। সব জিনিষই ব্যবহার্য্য।"

পাঁচু একটু হাসিয়া বলিলেন—"ঠাকুর দাদা—ঐ দেখুন আপনার "ব্যাসাসন" কেমন। দানসাগর শ্রাদ্ধে গীতা—বিরাট পাঠের ব্যাসাসন হইল কি না দুই আনা দামের কুশাসন। গালিচা আসন দেওয়া উচিত ছিল।"

সার্ব্বভৌম বলিলেন—"দেখ পাঁচু, অতিশয় লোভ করিতে নাই। জান ত শাস্ত্রে বলে—"অসন্তুষ্টা দ্বিজা নষ্টাঃ"। যজমান শ্রদ্ধাপূর্ব্বক যাহা দিবেন, আমাদের তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকা কর্ত্তব্য। রাধিকাবাবু যেরূপ দ্রব্যাদির আসাদন করিয়াছেন, তাহা আজকালকার দিনে কয়জন কৃতী পারে? ব্যাসাসনের কথা বলিতেছ, আজ স্বয়ং ব্যাসদেব যদি গীতা পাঠ করিতে

আসিতেন তবে তিনি গালিচার আসনে না বসিয়া এই কুশাসনই পছন্দ করিতেন।”

বিদ্যালঙ্কার বলিলেন—“অতি উত্তম বলিয়াছেন। পাঁচু এখন একবার রাধিকাবাবুকে ডাক—অনেক বেলা হইয়াছে। এখন সঙ্কল্প করিয়া কার্য্যারম্ভ করা যা’ক।”

পাঁচুর আর রাধিকাবাবুকে ডাকিতে হইল না। তিনি নিজেই আসিয়া উপস্থিত হইলেন। পাঁচু তখন বলিলেন “আমি ব্রাহ্মণ-ভোজনের উদ্যোগ করি গিয়া, আর রাক্ষসী বেলার পূর্ব্বে আদ্যশ্রাদ্ধও আরম্ভ করিতে হইবে।”

ইতিমধ্যে প্রায় পাঁচশত ব্রাহ্মণ ভোজনে বসিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে পাঁচুর নিজের বাটীর লোক কুড়ি জন হইবেন। পাঁচু নিজেই সন্দেশের হাঁড়ী লইয়া পরিবেশন আরম্ভ করিলেন। পরিবেশন করিতে করিতে একজন সমাজপতি ব্রাহ্মণকে ধীরে ধীরে বলিলেন—

“এই ত সন্দেশ দেখিতেছেন—ইহাতে ছানার নামগন্ধও নাই, কেবল চিনির ডেলা। আপনাদের পাতে ইহা দিতে আমার লজ্জা বোধ হইতেছে। দানসাগর শ্রাদ্ধে এইরূপ সন্দেশ?”

পাঁচুর কথা শুনিয়া সমাজপতি মহাশয় হাসিয়া বলিলেন,—“তুমিই ত কর্ম্মকর্ত্তা হে! আমাকে ও সন্দেশ আর দিও না।”

এই কথা শুনিয়া অনেক ব্রাহ্মণই সে সন্দেশ নিতে

অস্বীকার করিলেন। যাঁহারা পাতে নিয়াছিলেন, তাঁহারাও মাটীতে ফেলিয়া দিলেন।

এই সময়ে কর্ত্তা রাধিকা বাবু গললগ্নীকৃতবাসে সেই ভোজনের স্থানে আসিয়া সকলের নিকট আপনার দৈন্য-প্রকাশ করিলেন। তাঁহার কথার উত্তরে সেই সমাজপতি বলিলেন—"হাঁ, আপনি অর্থব্যয় যথেষ্ট করিয়াছেন, কিন্তু আপনার কর্ম্মচারিদের তত্ত্বাবধানের দোষে খাদ্য জিনিষ তেমন ভাল হয় নাই।"

আর একজন বলিলেন—"সন্দেশ গুলি নিতান্ত অখাদ্য—চিনির ডেলা।"

রাধিকা বাবু বলিলেন—"আজ্ঞে আমি নিজেই ত সন্দেশ প্রস্তুতের তত্ত্বাবধান করিয়াছি। অর্দ্ধেক ছানা, অর্দ্ধেক চিনি দিয়া সন্দেশ প্রস্তুত হইয়াছে।"

আর একব্যক্তি বলিলেন—"কিন্তু ছানাটা টক হইয়াছিল, সে জন্য সন্দেশ ভাল হয় নাই। ঐ দেখুন অনেকে সন্দেশ খাইতে না পারিয়া মাটীতে ফেলিয়া দিয়াছেন।"

আর একব্যক্তি বলিলেন—"আর রসগোল্লা যে হইয়াছে, তাহাতে রসের ছিটা ফোঁটাও নাই—যেন ইঁট পাটকেল। আপনি দানসাগর শ্রাদ্ধ করিতেছেন, কিন্তু খাদ্যাদির আয়োজন সেরূপ ভাল করিতে পারেন নাই।"

তখন সেই সমাজপতি বলিলেন—"তোমরা চুপ কর। ইহাতে কর্ত্তার কোন দোষ নাই। দোষ কর্ম্মচারিদের। উনি একলা কতদিক্ দেখিবেন ?"

এই সময়ে পাঁচু বলিলেন—"আপনারা অসন্তুষ্ট হইবেন না। সকল দোষ-সংশোধনের আমি উপায় করিতেছি। কর্ত্তা ভোজন দক্ষিণাটার বেলায় একটু বিবেচনা করিবেন।"

ইহা বলিয়া এক লম্ফ দিয়া তিনি রাধিকা বাবুর কাণে কাণে গিয়া বলিলেন—"দানসাগর শ্রাদ্ধ—চারি আনা ভোজন দক্ষিণার কম দেওয়া উচিত নহে। প্রত্যেক জনকে চারি আনা করিয়া দিলে ইঁহারা সন্তুষ্ট হইবেন। তখন সকল দোষ সংশোধন হইবে।"

রাধিকা বাবু এতক্ষণ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। এবার পাঁচুর কথা শুনিয়া বলিলেন—"আমি ত এত কথা আগে জানিতাম না। জানিলে কে এই দানসাগর শ্রাদ্ধে হাত দিত? কেবল আপনাদের পরামর্শেই আমি মজিলাম! যাহা হউক, যখন কার্য্য আরম্ভ করা হইয়াছে, তখন যে গতিকে হয় শেষ করিতেই হইবে।"

পাঁচু। তবে ভোজন-দক্ষিণার সিকিগুলি এখানে আনুন, আমি ইঁহাদের হাতে হাতে দিয়া যাই। সে দেখিতে বেশ "সুশ্রাব্য" হইবে।

রাধিকা বাবু ভোজন দক্ষিণা আনিতে বাড়ীর মধ্যে গেলেন। পাঁচু মনে মনে হিসাব করিলেন, তাঁহার কুড়িজন আত্মীয় কুটুম্বের দরুণ তাঁহার পাঁচ টাকা পাওনা হইবে। তখন তিনি আবার পরিবেশন কারতে কোমর বাঁধিয়া লাগিয়া গেলেন। এবার ভাঁড়ার ঘরে গিয়া পাঁচু খুব ভাল সন্দেশ বাহির করিয়া আনিয়া সকলকে দিতে লাগিলেন।

কিন্তু তাহাতে আবার একটু গোল বাধিল। পাঁচু আর একবার সন্দেশ আনিতে গেলে ভাণ্ডারের কর্ত্তা বলিলেন, "আপনাকে এই মাত্র এক হাঁড়ী সন্দেশ দিলাম, তাহা কি হইল ?"

পাঁচু খুব রাগ করিয়া বলিলেন, "কি তোমার ছোট মুখে বড় কথা ? আমি কি সে সন্দেশ বাড়ীতে নিয়া গিয়াছি ?"

এইরূপ ভুমুল ঝগড়া বাধিল। তখন রাধিকা বাবু আসিয়া সে ঝগড়া থামাইয়া দিলেন। লিখিতে লজ্জা হয়—যথার্থই পাঁচু সেই এক হাঁড়ী সন্দেশ বাড়ী পাঠাইবার জন্য স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। তিনি নিঃস্বার্থ ভাবে কোন কাজ করেন না।

যাহা হউক এইরূপ কোন রকমে রাধিকা বাবু তাঁহার মাতার দানসাগর শ্রাদ্ধ শেষ করিলেন। ইহাতে তাঁহার অর্থব্যয় যথেষ্ট হইলেও যশঃ অপেক্ষা অপযশঃই বেশী হইল। তিনি

দানসাগর শ্রাদ্ধ আরম্ভ করিয়া অর্থব্যয়ে কৃপণতা করিয়াছেন, পাঁচু নিজেই তাঁহার এই নিন্দা প্রচার করিতে লাগিলেন।

(৩)

এই শ্রাদ্ধের তিন মাস পরে রাধিকা বাবু অত্যন্ত পীড়িত হইলেন। গ্রাম্য ডাক্তার তাঁহার চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন, কিন্তু তাঁহার রোগ অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়িল। সামান্য জ্বর জ্বরাতিসারে পরিণত হইল। সংবাদ পাইয়া তাঁহার একমাত্র পুত্র সতীশ কলিকাতা হইতে বাড়ীতে আসিল। কিন্তু সুচিকিৎসার উপায় কি? তাঁহার হাতে একটিও পয়সা নাই; তিনি শ্রাদ্ধকার্য্যে যথাসর্ব্বস্ব ব্যয় করিয়া ফতুর হইয়াছেন। জেলার উপর হইতে ভাল ডাক্তার আনিতে হইলে অনেক টাকার প্রয়োজন। সতীশ এতদিন নিজের পড়াশুনা নিয়াই থাকিত, সংসারের কোন ধার ধারে নাই। ঘরে এরূপ গহনাপত্র নাই যাহা বন্ধক দিয়া টাকা আনিতে পারে। এ দিকে রাধিকা বাবু ঋণ করিতে আর কাহারও নিকট বাকী রাখেন নাই। সুতরাং এই ঘোর বিপদের সময় সতীশ নিতান্ত নিরুপায় হইয়া পড়িল। যে সব প্রতিবেশী তাঁহাকে শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে অতিরিক্ত ব্যয় করিতে উৎসাহিত করিত, এখন তাহাদের টিকিও দেখা যায় না। সেই পাঁচু পুরোহিতের ত কথাই নাই। স্মৃতিতীর্থ

খুড়া একদিন আসিয়া স্বস্ত্যয়ন করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন কিন্তু অর্থাভাবের কথা শুনিয়া সরিয়া পড়িয়াছেন। পাড়ার প্রসন্ন বাবু এই সময়ে আসিয়া সতীশের সহায় হইলেন। তিনি ভিন্ন জাতীয় হইলেও রাধিকা বাবুর চরিত্রের গুণে তাঁহাকে খুব শ্রদ্ধা করিতেন এবং তাঁহার হিতৈষী ছিলেন। তিনি সতীশকে বলিলেন, "বাবা—তোমার কোন চিন্তা নাই। তোমার বাবার চিকিৎসায় যত টাকা লাগে আমি দিব।" সতীশ তাঁহার এই কথায় অকূলসাগরে যেন কূল পাইল এবং প্রসন্ন বাবুকে ঈশ্বর-প্রেরিত দূত মনে করিল। প্রসন্ন বাবুই লোক পাঠাইয়া একজন সুবিজ্ঞ এসিষ্টাণ্ট-সার্জ্জন আনাইলেন। তাঁহার চিকিৎসা চলিতে লাগিল। কিন্তু রোগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তিনি মৃত্যু আসন্ন জানিয়া সতীশকে এইরূপ উপদেশ দিলেন, প্রসন্ন বাবুও সেখানে উপস্থিত ছিলেন ;—"বাবা সতীশ আমি তোমাকে অকূলসাগরে ভাসাইয়া চলিলাম। আমার বিষয়ের যে আয় তাহার পাঁচগুণ ঋণ হইয়াছে। শেষের এই দানসাগর শ্রাদ্ধের খরচটা সমস্তই কর্জ্জ করিয়া করা হইয়াছে। প্রসন্ন দাদা, আপনাদের পরামর্শ তখন না শুনিয়া আমি নিতান্ত মাটী খাওয়া কাজ করিয়াছি। পাঁচু পুরোহিতই আমাকে সর্ব্বস্বান্ত করিলেন। যাহা হউক, বাবা সতীশ, মনে রাখিও নিজের অবস্থার অতিরিক্ত কোন

কাজ করিও না। আমাদিগকে কষ্ট দিয়া স্বর্গীয় পিতা মাতা কখনও সুখী হইতে পারেন না। স্বর্গে গেলেও তাঁহারা আমাদের জন্য ভাবেন, সর্ব্বদা আমাদের মঙ্গল কামনা করেন। আজ এই দানসাগর শ্রাদ্ধ করিয়া আমি সতীশকে অকূল-সাগরে ভাসাইয়া গেলাম, ইহাতে আমার স্বর্গীয় জননীর মনে ক্লেশ হইবে ভিন্ন তৃপ্তি হইবে না, কারণ সতীশ তাঁহার বড় আদরের বস্তু। আর বাবা সতীশ এ কথা মনে রাখিও, মানুষ মৃত্যুর পরে নিজের কর্ম্মানুযায়ী স্বর্গ-নরকাদি ভোগ করে; যে পাপ করিয়াছে হাজার দানসাগরেও তাহার মুক্তি নাই; আবার যিনি জীবনে পুণ্য কার্য্য করিয়াছেন, বহু আড়ম্বরে তাঁহার শ্রাদ্ধ না করিলেও তিনি স্বর্গে গমন করিবেন। আমাদের শাস্ত্র খুব উদার, সকল অবস্থার লোকের উপযুক্তই ব্যবস্থা ইহাতে আছে। আমি এ সব বুঝিয়াও কেন পুরোহিত ঠাকুরের পরামর্শে মজিলাম সেজন্য এখন আমার অনুতাপ হইতেছে। যাহা হউক, বাবা তোমাকে বলিতেছি, তুমি আর এরূপ ভুল করিও না। আমার শ্রাদ্ধ অতি সংক্ষেপে শেষ করিবে। বিষয়-সম্পত্তির অধিকাংশ বিক্রয় করিয়া ঋণশোধ করিও—নচেৎ সবটুকু যাইবে; ঈশ্বরেচ্ছায় তুমি এবার বি, এ পাশ করিতে পারিলে আবার বিষয় করিতে পারিবে। আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি তুমি দীর্ঘজীবী হইয়া সৎপথে থাক।

প্রসন্ন দাদা, তবে বিদায় দিন, আমার সতীশকে আপনার হাতে দিয়া চলিলাম।”

ইহা বলিতে বলিতে ক্রমে তাঁহার বাক্‌রোধ হইল। তিনি সজ্ঞানে ইষ্টমন্ত্র জপ করিতে করিতে দেহত্যাগ করিলেন।

রাধিকা বাবুর মৃত্যু-সংবাদ প্রচার হইলে, পাঁচু পুরোহিত আবার ঘন ঘন যাতায়াত আরম্ভ করিলেন। পরে একদিন তিনি কেনারাম স্মৃতিতীর্থের সহিত সতীশের নিকট শোক-প্রকাশ করিতে আসিলেন।

পাঁচু বলিলেন—“আহা! কর্ত্তার মত পুণ্যবান্ লোক আর হয় না।”

স্মৃতিতীর্থ বলিলেন—“রাধিকাবাবু যাওয়াতে যেন একটা দিক্‌পাল পতন হইয়াছে।”

পাঁচু।—সেই দানসাগর শ্রাদ্ধ করিয়া তিনি এ দেশে অক্ষয়-কীর্ত্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। এরূপ বড় কার্য্য এ পর্য্যন্ত কেহই এ দেশে করিতে পারে নাই।

স্মৃতিতীর্থ।—“কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি”। বাবা সতীশ তাঁহার কীর্ত্তি একবার স্মরণ কর। তুমি তাঁহার উপযুক্ত পুত্র”—

এই সময়ে প্রসন্নবাবু আসিয়া বলিলেন—“আবার বুঝি আপনারা সতীশকে ভজাইতে আসিয়াছেন? কিন্তু এবার ভাণ্ড তৈল শূন্য। কর্ত্তা নিজেই সতীশকে সে বিষয়ে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন।”

স্মৃতিতীর্থ।—"তিনি যেরূপ কীর্ত্তিমান পুরুষ ছিলেন, অবশ্য শ্রাদ্ধও সেইরূপ করিতে উপদেশ দিয়াছেন। সেই বিষয়ে আমাদের বলা অধিকন্তু। কি বল পাঁচু"—

পাঁচু।—আজ্ঞে; ঠিক কথা।

প্রসন্নবাবু বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"আপনারা যাহা মনে করিয়াছেন, সে গুড়ে বালি। এই শ্রাদ্ধে মাত্র একশত ব্যয় হইবে। তাহাও আমি দিতেছি।"

এই নির্ঘাত কথা শুনিয়া পাঁচু পুরোহিত চারিদিকে সরিষার ফুল দেখিলেন। পরে সতীশ ইংরেজী পড়িয়া নাস্তিক হইয়াছে, ইংরেজীনবীশ প্রসন্নবাবুও তাহাকে কুপরামর্শ দিতেছেন, ইত্যাদি বলিতে বলিতে তাঁহারা প্রস্থান করিলেন।

A

SIMPLE ENGLISH GRAMMAR

IN

BENGA I

BIRENDRA NATH CHAKRAVARTI, M. A.

Asst. Head Master Kani Bhabani School, Examiner Calcutta University.

A

NIRMAL CHANDRA SINHA, M. A.

Head Master, Keshub Academy.

Second Edition.

CALCUTTA

PUBLISHED BY

SARAT CHANDRA MITRA & SRISH CHANDRA MITRA

The New Bengal Press : 68, College Street.

Price 7 Seven Aannas only.